

গুরুচণ্ডা৯e

www.guruchandali.com

বিশেষ সংখ্যা: দেবেশ রায়

বিশেষ সংখ্যা: দেবেশ রায়

প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদক - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক - তাপস দাশ

সম্পাদনা সহায়তা - অনির্বাণ বসু, সোমনাথ রায়, পিনাকী মিত্র

বিশেষ সহায়তা - রন্তিদেব রায়

ই-বুক প্রস্তুতি - রাবিন্দ্র করঞ্জাই

প্রচ্ছদ - সায়ন করভৌমিক

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য- ৩০ টাকা (INR 30)

দেবেশ রায় বাংলার খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখক। না হলে এই সংখ্যার প্রয়োজন হতনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষায় বা বাংলায় দেবেশ রায়ই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নন। তাই এটি গুরুচণ্ডা৯e-র একমাত্র সংখ্যা নয়। অন্তত হবার কথা নয়। আমাদের পরিসর অসীম, কাল নিরবধি। নীড় তৃতীয় বিশ্ব হলেও আকাশ তো বড়। বাংলা লেখালিখির এ ছাঁদনাতলায় আমাদের অনেককালের ওড়াউড়ি। অকস্মাৎ থেমে যাবার কোনো কারণ নেই। এতদিন আমরা অন্তর্জালে লেখা বার করছিলাম। বইমেলায় দাপাদাপির বিষয় ছিল ছাপা বই। ক্রমশ যোগ হয়েছে ই-বই, আর এবার এল ই-পত্রিকা। এটি শুরু মাত্র, নিয়মিত ব্যবধানে এই পত্রিকা প্রকাশ হয়ে চলবে।

পত্রিকার এই সংখ্যাটির ন্যূনতম সহায়ক একটি মূল্য থাকছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক কোনো বিনিময়মূল্য নেই। গুরুচণ্ডা৯র ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে আপনি নামিয়ে নিয়ে পড়তে পারবেন। তবে আমরা চাইব, আপনি একই সঙ্গে গুরুর গ্রাহকও হয়ে যান, বা ইচ্ছেমতো সহায়ক মূল্যও দিন। শুধু টাকা পয়সার কারণে নয়, সে কারণ তো আছেই, এই বিপুল কর্মকাণ্ড যা আমরা ফেঁদে বসেছি, তা এমনি এমনি চলেনা, অর্থের প্রয়োজন হয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমরা চাই, আপনিও এই কর্মকাণ্ডের শরিক হন। এই কাজকারবার হয়ে উঠুক আপনার নিজের সৃজনশীলতার কারখানা, মতামত দেবার মঞ্চ।

গুরু ধরুন, গুরু পড়ুন। গুরুভার বহন করুন।

সংখ্যা সম্পর্কে

১৭ ডিসেম্বর, ২০২০, দেবেশ রায়ের ৮৩ তম জন্মদিন। ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০, দেবেশ রায়ের মৃত্যুর পরের প্রথম জন্মদিন।

এই বছরের এই নির্দিষ্ট দিনটিতে দেবেশ রায়কে নিয়ে অনেক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ারই কথা। এ সংখ্যা তার মধ্যে কেবলমাত্র একটিই হওয়ার কথা।

কিন্তু, কিঞ্চিৎ শ্লাঘা সহযোগেই বলার, এ তেমনই একটা নয়। এ শ্লাঘায় অবশ্য তত অশিক্ষাও জুড়ে নেই, যার জেরে দাবি করে ফেলা যায়, এটিই সেরা। কিন্তু এমত বিশ্বাস রয়েছে, এ সংখ্যা হারিয়ে যাবার মতও নয়।

আখ্যান ও অনাখ্যান মিলিয়ে দেবেশ রায়ের যে গদ্যসাহিত্য, তা নিরালম্ব ছিল না কদাপি। যা ছিল না, তা সেই স্বাবলম্বী রচনাগুলিকে খুঁটিয়ে পড়ার বাসনাসমৃদ্ধ পাঠককুল।

ফলে, এ সংখ্যায় অনেক লেখা নেই। মাত্র ১১টি। তার একটি তো দেবেশেরই লেখা। একটি আংশিক পুনর্মুদ্রণ, আরেকটি, মুদ্রিত লেখার বিস্তারিত সংস্করণ। কয়েকটি লেখা রেডিও কোয়ারান্টাইনে দেবেশ রায় সম্পর্কিত কথিকায় প্রচারিত ভাষ্যের লিখিত ও সংবদ্ধ রূপ।

এমন নয়, যে আমরা অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি

বলে অনেক লেখা প্রকাশ করতে পারলাম না। আমরা, বাছাই লেখাই চেয়েছি। দেবেশ রায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপনের পদ্ধতি কী হবে, কী হওয়া উচিত, তা যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, পেরেছেন, তাঁদের লেখা নিয়ে একটি সংকলন করাই ছিল আমাদের আরব্ধ। সে তালিকায় আরও অনেকানেক নাম যদি যুক্ত হওয়ার মত থাকত, তাহলে আমরা সত্যিই আনন্দিত হতাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের দুনিয়া এখনও তত সাবালক হয়নি।

দেবেশ রায়ের লেখালিখির চিন্তাবিধুর মূল্যায়ন আরও ঘটুক, এমনটাই আশা। দেবেশ পরবর্তী প্রজন্মে আস্থা রাখতেন, রাখার কথা ভাবতেন। তাঁর জীবৎকালে অবশ্য সে আস্থা আদৌ তত পরিণতি দেখিয়ে ওঠেনি। অন্তত তেমন প্রকাশ ঘটে ওঠেনি।

চর্চার সেই অনভ্যাসের বদল ঘটুক, না-থাকা দেবেশের প্রথম জন্মদিনে এর চেয়ে বেশি কী-ই বা চাইবার থাকতে পারে?

সূচিপত্র

আনন্দবাজারে গল্প দিলাম না কেন

দেবেশ রায়

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক (দোল পূর্ণিমা) সংখ্যার সম্পাদক উক্ত সংখ্যার জন্য আমার কাছ থেকে একটি 'ছোটো গল্প প্রার্থনা' করে গত ৭.১.৬২ তারিখে চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় আমাকে লিখতে অনুরোধ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি তাঁদের জানিয়েছি যে, আনন্দবাজার পত্রিকার এই বার্ষিক সংখ্যায় গল্প লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঘটনাটা ব্যক্তিগত। কিন্তু যে-যে কারণে আমি তাঁদের এই অনুরোধ প্রত্যাখান করতে বাধ্য হয়েছি তার একটিও ব্যক্তিগত নয়। সে কারণেই আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

২০শে অক্টোবর ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের উত্তরসীমান্তে চিন-ভারতের আকস্মিক সংঘর্ষ পৃথিবীর সকল মানুষের কাছেই বজ্রপাতের মতো। এ-সংঘর্ষ আমাদের স্বপ্নকে বিপর্যস্ত করেছে, যে স্বপ্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও শান্তি আন্দোলনের উর্বর মাটিতে গত সত্তর বৎসর ধরে ধীরে-ধীরে মাথা তুলেছে এ-সংঘর্ষ সেই স্বপ্নকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়ার নিশ্চিত শক্তিকে আমাদের বিশ্বাসকে পর্যন্ত কঠিন আঘাত দিয়েছে—যে বিশ্বাস বান্দুং আর পঞ্চশীলের হৃৎপিণ্ড থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের ধমনিতে ছড়িয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় আমরা হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তার পরই পৃথিবীর তাবৎ শান্তিকামী মানুষ এ যুদ্ধ বন্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইতিহাসের কাছে এই শতকের শেষার্ধের মানুষ আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুদ্ধহীন পৃথিবীর শর্তে। যে শপথ আমাদের রক্ষা করতেই হবে। সে শপথ রক্ষা করার একমাত্র উপায় বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সম্মিলন। মানুষের এই মহাসম্মিলন সাধন করা আমাদের কাজ—সারা দুনিয়ায় ও নিজের দেশে।

এই কর্তব্য আনন্দবাজার পত্রিকা কি পালন করেছে? বর্তমান অবস্থায় আনন্দবাজার পত্রিকার ভূমিকা কী?

চিনের মারাত্মক ভুল রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তাঁরা প্রথম থেকে চিহ্নিত করলেন মহান চিনা সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরূপে। চিন সম্পর্কিত ক্রিয়াপদে ‘ন’ ব্যবহারেও তাঁরা আপত্তি করলেন। লজ্জার সঙ্গে লক্ষ করলাম—রবীন্দ্রনাথের দেশ সে নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করল।

আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের সান্ধ্য-সংবাদের কোনো কোনো বক্তার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট কাঁপে না বলে তাঁদের অপসারণ দাবি করা হল।

‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় যে ৩৬ জন সাহিত্যিকের বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাদের বিদ্রুপ ও নিন্দা করে আনন্দবাজার সম্পাদকীয় লিখেছেন।

শিল্পের কয়েকজন স্বেচ্ছা-নির্বাচিত অভিভাবকের মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অঙ্গার নাটকের অভিনয় বন্ধের জন্য গুন্ডামিকে আনন্দবাজার অভিনন্দিত করলেন।

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ‘দেশ’ সাপ্তাহিকে প্রশ্ন উঠল “সত্যজিৎ রায় নীরব কেন?”

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ পোস্টার পোড়ানোর ঘটনা কেন্দ্র করে নিরপেক্ষ তদন্তের বিরুদ্ধে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলা-বিভাগের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সম্পাদকীয় লিখলেন।

তা ছাড়া ভারতবর্ষের পরিকল্পিত অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা, জোটনিরপেক্ষতার পররাষ্ট্রনীতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও শান্তির নীতিকে প্রথমদিন থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা চিহ্নিত করলেন, পয়লা নম্বরের শত্রু হিসাবে। মিগ বিমান আসবে না, চিনা-কনসাল প্রস্থানকালে কমিউনিস্টদের প্রায় লক্ষ টাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে গেছেন ইত্যাদি পর্বতপ্রমাণ মিথ্যা থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে, অসংখ্য সাধারণ নরনারীর বিরুদ্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিদিন শ শ মিথ্যা প্রচার করছেন।

এইসব আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের জালে সমস্ত বাংলাদেশের বিবেককে বাঁধা রাখতে চাইছেন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট বাংলার ও ভারতবর্ষের শিল্পী-সাহিত্যিকগণের এখন দেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদের সুচতুর, সুপরিকল্পিত অভিযানকে চিনবার সময় এসেছে। চিন এবং আনন্দবাজার উভয়ের বিষয়ে আজ সমানভাবে সতর্ক হওয়ার সময়। যে সকল সাহিত্যিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ‘দেশে’ সমাজতন্ত্র ও মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করছেন তাঁদের সচেতন হবার সময় এসেছে। এবং আনন্দবাজার পত্রিকার এই সর্বনাশা ফ্যাসিবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণের সমবেত হবার সময় এসেছে।

এই বোধ থেকেই আনন্দবাজার পত্রিকায় গল্প লিখবার জন্য আমার কাছে যে অনুরোধ এসেছে তা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এবং আশা করছি এই প্রত্যাখ্যানের ফলে আমি নিজেকে বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান সাহিত্যিকগণের সঙ্গে সমবেত দেখতে পাব।

পুরাণ-বৃত্তান্তে প্রান্তিকের জরিপ

অভীক মজুমদার

১. প্রথমে শুনি দেবেশ রায়ের নিজের কথা। "...জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনে বিবৃত প্রকৃতি, রাজবংশী বাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের লোকজন, ফরেস্টের গাছপালা, জঙ্গল, পশুপাখির এক ভুবনে আমার অধিকার কায়েম হতে শুরু করল, দিনের পর দিন ধরে, বছরের পর বছর ধরে। রাজনীতির অজস্র দৈনন্দিন কাজের আষ্টেপৃষ্ঠে লিপ্ততা ছাড়া এ অধিকার আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না, কারণ এ কোনো ভ্রমণের অধিকার নয়, এ কোনো দর্শন-শ্রবণের অধিকার নয়। এক জনপদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়া, সেই জীবনযাপনের ইতিহাস-ভূগোল এর সঙ্গে সেঁটে থাকা। আমার আর কোন উদ্ধার ছিল না। বা সেই ছিল আমার একমাত্র উদ্ধার। ...বছরের-পর-বছরের অজস্র গ্রন্থিতে এসব এক বিদ্যুৎ-সংবহন ব্যবস্থার ভিতরে আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি যার বাইরে আমার কোন প্রজ্বলন নেই, কোন শিহরণ নেই। আবার অন্যদিকে জলপাইগুড়ির কোন লোকজীবনই যেন এখনো আমার গল্প-উপন্যাসের পরীক্ষাভূমি- তা সে ঘটনা বা চরিত্র ভারতবর্ষের যে অঞ্চলেরই হোক না কেন..." (ভূমিকা/ গল্পসমগ্র ২)

"একজন ঔপন্যাসিক লিখতে চাইছে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা। ব্যক্তির ইতিহাস মানে ব্যক্তির জীবনী নয়। সেই জীবন যে ইতিহাসের অংশ সেই ইতিহাসে সেই ব্যক্তি কে স্থাপন করাই উপন্যাস-এর কাজ।" (সাক্ষাৎকার/১৩৯৬)

দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) বাংলা সাহিত্যের সেই বিস্ময় যিনি নিজস্ব ঘরানা-বাহিরানা-এ বিপুল সমাজ বিশ্ব আর ব্যক্তি মানুষকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে গভীর সংবেদনে তরঙ্গায়িত করেছেন। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য সেই দূরপাল্লার নৌবহর। দূরবিনের দুই দিক দিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে দেখে গেছেন দেশকাল, প্রান্ত-প্রান্তিক, ভগ্ন-বিধ্বস্ত তথা প্রতিরোধী বাস্তবতা। ইতিহাস পুরাণের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষের উত্থান তাঁর প্রিয় বিষয়। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সমুজ্জ্বল।

'যযাতি', 'মানুষ খুন করে কেন', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে' থেকে 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপুরাণ', 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' কিংবা সাম্প্রতিক 'সাংবিধানিক এজলাস'(২০১৯) সেই অভিযাত্রার প্রতিচিত্রায়ণ। 'কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মী হিসেবে তাঁর জনবৃত্তে পদার্পণ, সে কথা বারংবার মনে করিয়ে দেন তিনি, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনায় পার্টিতন্ত্র বা দলদৃষ্টি নয়, একটা বহুবিচিত্র স্বরসঙ্গতি ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে। সমাজ-সংসার অতীত-বর্তমান ক্ষুদ্র-তুচ্ছ কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি মহাকায় এক ভবিষ্যতের আভাস পাঠককে দেন। এই 'মহাকায়'কে নির্মাণের সাধনাই দেবেশের নিজস্ব অঙ্গুরীয়ক। বহুমাত্রিক বহুস্রোতা আখ্যান নির্মাণের কারিগরিতেই দেবেশের সিদ্ধি। হয়তো সে জন্যই প্রথম দিকের রচনায় তিনি প্রতীক এবং সংকেতকে বারংবার ব্যবহার করেন। চলন্ত বন্ধ ট্রেনের কামরায় বাইরে থেকে যারা ঢুকতে চাইছে তাদের নিয়ে কামরার মানুষ ভয়ার্ত, নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। "এই চার যুবক কোন দলের? মারবার না বাঁচাবার? এই চার মানুষ কী

চায়? মারতে না বাঁচতে? জীবন কি এই কামরায় নারী ও শিশুতে কাঁদছে, নাকি বাইরে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছে? এটা কি বাঁচা না মরা?" লক্ষ করুন, গল্পের নাম। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?'। অকল্পনীয় ব্যঞ্জনা! 'আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে' কাহিনিতে শেষে বীভৎস ফ্যান্টাসি সেই মৃত্যু উপত্যকাকে সংকেতে ধরে ফেলে। 'শান্তিকল্যাণ' শব্দের বিস্ফোরণ ধ্বনিত হয়।

দেবেশ রায়ের কলমের সাহস এবং ধারণক্ষমতা বারংবার করতালিযোগ্য হয়ে ওঠে এভাবেই। প্রবহমান বিন্যাসে একটু নৈর্ব্যক্তিক জলধারার মত ঘটনাবলি আখ্যানে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে তাঁর মহাঅবয়ব। চরিত্র, ঘটনা, কথকভাষ্য, অতীত, বর্তমান, ইতিহাস, সংবাদ, রেডিও, সরকারি তৎপরতা অথবা নিষ্ক্রিয়তা, চায়ের দোকানের আলোচনা, রান্নাঘর, অরণ্যবাস্তবতা, হাসিকৌতুক, বিবরণ সব মিলেমিশে অত্যাশ্চর্য আখ্যান উৎসবের জন্ম দেয়। বাংলা কাহিনিগ্রন্থনে দেবেশের এই নিজস্ব পরিকল্পনা পাঠককে ক্রমাগত বিস্ময়াবৃত এবং অসহায় করে তোলে। কাহিনির মধ্যে ঢুকে পাঠক যেন জাদুবলে আখ্যানের শিল্পরূপে ভেসে যেতে থাকেন। পাঠকও হয়ে ওঠেন ঐ ইতিহাস প্রবাহের শরিক।

২. ১৯৮৯ সালে একটি সাক্ষাৎকারে দেবেশ রায় জানিয়েছিলেন, "প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক হিসেবে লিখেছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক হিসেবে রিঅ্যাক্ট করেছি, বাইরে থেকে দেখলে প্রথম পরিচ্ছেদ উপন্যাস, দ্বিতীয়তে আত্মসংলাপ। এইভাবে। কিন্তু উপন্যাস তো ওই ভাবে তৈরি হয় না। ফর্মটাকে আমি বাইরের জিনিস মনে করি না। একটা ফর্ম যখন তৈরি হয় তখন লেখক বিষয়টাকে কিভাবে ধারণ করেছেন, তাই ফর্ম হয়ে যায়।... আমি দেখবার সময় পাঠকের এইটুকু সাবধান করতে চেয়েছি যে তাঁরা যেন একে আমার অভিজ্ঞতা মনে না করেন। পাঠক ও লেখকের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা করে তুলতে

চেয়েছি।”

আখ্যানের ফর্ম বা আঙ্গিক নিয়ে দেবেশের মত ‘সচেতন’ ভাবুক বাংলা সাহিত্যে বিরল। সমকালে তুলনা করা যেতে পারে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য এবং রবিশংকর বলের সঙ্গে। তবে তাঁরা কেউই দেবেশ রায়ের মতো এতো ধারাবাহিক নিষ্ঠায়, শ্রমে এবং প্রেমে, ‘বিকল্প আদর্শ’ খুঁজতে এবং সেই সন্ধানপ্রক্রিয়া নিয়ে লেখালিখি করেননি। ‘উপন্যাস নিয়ে’ এবং ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ দেবেশ রায়ের সেই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট নির্মাণের নিরলস প্রয়াসকে বিম্বিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রযোজিত ইউরোপীয় নভেল ঘরানার প্রতিস্পর্ধী এক ‘নিজস্ব’ ‘দেশীয়’ ঐতিহ্যকে আখ্যান সৃষ্টিতে খুঁজেছিলেন দেবেশ রায়। সেজন্য তিনি মননঋদ্ধ নিষ্ঠায় ফিরে গিয়েছিলেন ‘পালাকীর্তনে’ ‘মঙ্গলকাব্যে’ কিংবা ‘গ্রামীণ বাচনে’। আক্ষেপ করে বলেছেন, “তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, নবীন নবীন আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা গল্প উপন্যাস বাঙালি লোকজীবন থেকে সরে গেছে। তার ভাষা থেকে ঝরে গেছে লোকবাচনের রহস্যময়তা অথচ স্পষ্টতা, লোককৌতুকের প্রবল পৌরুষ, পৌরাণিককে ভেঙে ফেলার অদম্য সাহস আর কাহিনিকারের নিজস্ব বিবরণের স্পষ্টতা।” (উপন্যাস নিয়ে/পৃ:২৮)

আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কেন তাঁর কথাসাহিত্যে ‘বৃত্তান্ত’, ‘পুরাণ’, ‘প্রতিবেদন’ নামকরণে ফিরে ফিরে আসে।

এখানেই শেষ নয়। দেবেশ রায় একই অনুসন্ধিৎসায় পৌঁছে যান বাখতিনের ‘ডায়ালজি’ থেকে ‘পলিফনি ‘উদ্ভবের হালহদিশে। চলে যান থিওডোর অ্যাডর্নোর ‘নাৎসিবাদ বিরোধী’ শিল্প-সাহিত্য তত্ত্বের সন্নিকটে, জনসংযোগের পদ্ধতি চর্চায়। তাঁর লেখা থেকে আমাদের এখনকার ভারতীয় অস্তিত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্নাতুর হয়ে উঠতে পারি–

'সে ভারতীয় অস্তিত্বও আধুনিক বিশ্বেরই একটি অংশ।'

৩. 'বিকল্প আদর্শ' শুধু আখ্যানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি দেবেশ, হয়তো তাঁর দীর্ঘ জীবনচর্যায় লেখকের আত্মসম্মান চিহ্নিত 'স্বাধীনতা'-কেও তিনি 'বিকল্প' হিসাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন। লেখার 'মান' যখন আপোশ করে বাজারে পণ্যের চাহিদা-যোগান এবং অর্থকামনার সঙ্গে, যখন বছরে বছরে লেখককে বাধ্যত লিখে যেতে হয় পরিকল্পনাহীন, অগভীর, একমাত্রিক পৌনঃপুনিকতা, যখন উদঘাটন কিংবা উদ্ভাবনের তুলনায় লেখককে শাসন করে সাহিত্যশ্রেষ্ঠীর অঙ্গুলিনির্দেশ, তখন দেবেশ মনে করেন, জনপ্রিয়তার কুহকী হাতছানিতে বিনষ্ট হয় লেখকের 'স্বাধীনতা', লেখকের দার্ঢ্য। তিনি এই 'বিকল্প' অবস্থানের শরিক হতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাংলা আখ্যাননির্মাণকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় দ্যুতিদীপ্ত করতে। সে জন্য এক একটি রচনার জন্য হয়তো ৫-৭ বছর নিতেও তাঁর আটকায়নি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "পাঠকের প্রত্যাশা, লেখকের অভিজ্ঞতা মিলে উপন্যাস শিল্পের লায়েক (Adult) চেষ্টা দেখা দেবে মনে হয়। তবে সবটাই ব্যক্তিক প্রতিভার ওপর। ... শেষ পর্যন্ত একজন লেখক একজনই লেখক।"

এই বিকল্প সন্ধানী লেখকসত্তার জোরেই তাঁর গদ্যরীতিও সচেতন আয়তনে পল্লবিত হয়। তরল, সহজপাচ্য গদ্যে এই বিশাল অঙ্গসংস্থান হয়তো সম্ভব ছিলনা। তবে লক্ষণীয়, তাঁর সংলাপের নির্মাণ, বিবরণের উপস্থাপনা আর অন্তরমহলের টীকাভাষ্য ঈষৎ আলাদা হয়ে যায়। স্বাধীনতা-উত্তর, বিশেষত বিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে দেশ-দুনিয়ার পরিবর্তমান পরিস্থিতি, উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল, পুঁজির নতুন নতুন জটিল কৌশল, প্রভুত্ব আর কর্তৃত্বের নতুন নতুন নকশা, রাষ্ট্রক্ষমতার নিষ্পেষণ আর নয়া নিয়ন-বাস্তবতা তাঁর মত আর কেইবা এত যত্নে আর বিস্তারে প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছেন

কথাসাহিত্যে?

৪. ঠিক এই প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ে আরো একটি প্রাসঙ্গিক শব্দ। ‘প্রত্যাখ্যান’। দেবেশ রায়ের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা, যারা নিঃস্ব, পরিচয়হীন, হা-ঘরে, অথচ জীবন্ত মানুষ, তারা ‘আধুনিক’ উন্নয়নের সমস্ত প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করে। হয়ে ওঠে পুরাণ বা লোকগাথার আদিম অতিকায় এক প্রাকৃতিক শক্তি। সে প্রান্তিক থেকে হয়ে যায় মহাবিকল্পের দ্যোতনাবাহী লোকনায়ক। ইতিহাস থেকে তাঁর উত্থান, ‘আধুনিকতা’কে তাঁর প্রত্যাখ্যান।

“বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তাঁর জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল। ...এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক...” (তিস্তাপারের বৃত্তান্ত)

কখনো এই প্রত্যাখ্যানের আয়ুধ নির্মিত হয় প্রায় কোনো জাদুবাস্তবের মায়াপ্রতীকে—

“কেন কেলু? বসে থাকবে কেন?”

“বসে থাকা মানে তো দরওয়াজা হয়ে যাওয়া। আমি দরওয়াজা হয়ে বসে থাকবো?”

“কেন কেলু? বসে থাকবে কেন?”

“কেউ যদি কিছু দেখতে চায় আমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে।”

“কী দেখবে কেলু? কী দেখবে?”

“আমি যা যা দেখে এলাম, সেইসব দেখবে, যদি কেউ দেখতে চায়।”

“আমাকে দেখাও, আমি তো দেখতে চাই।”

“এইতো আমি দরওয়াজা হয়ে বসে আছি। আমার ভেতর দিয়ে

তাকাও।"

"এই তাকাচ্ছি, কেলু।"

"দেখো, গাছের শিকড় আকাশে বিঁধছে, সমুদ্রের জলে আগুন, পুনাসি বাঁধের ঢালে সব আউরতরা উজারা হয়ে পড়ে আছে। এখন কোথাও যাওয়ার সময় নাই।"

অথবা, তার পরই—

"দুই পায়ের মধ্যে লাঠি আর কোলের ওপর ঝোলা নিয়ে বিশ্বনাথ যে আচ্ছন্নতাঁর ভিতর চলে গিয়েছিল সেখানে মাও-ৎ সে-তুঙ এর সঙ্গে তাঁর একটা ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ হয়।" (সময় অসময়ের বৃত্তান্ত)

আবার,

"যোগেন একটু অস্থিরতা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা খুলতে চায়। পারেনা। তার এসকর্ট হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। যোগেন একবার চাক্ষুষ করতে চায়—সেই পর তাঁর বিদ্রোহের আর্য প্রবেশের ও এখন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার।

যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র..."

(বরিশালের যোগেন মণ্ডল)

একটা পথের সামনে যেন এই প্রত্যাখ্যান মূর্ত হয়ে ওঠে। আখ্যানেরও বিমোচন ঘটে। ইতিহাস থেকে ভবিষ্যতে, ব্যক্তি থেকে মহাকালে, একক বৃত্ত থেকে সমুদ্রসংক্ষোভে-পথই পথের চিত্রকল্পসমূহকে লালন করতে থাকে, দিশা দেখায়।

৫. ব্যক্তিগত স্মৃতি-বিস্মৃতি সর্বদাই নশ্বরের সঞ্চয়। পিতৃবন্ধু হিসেবে আশৈশব তিনি ঘনিষ্ঠজন। মতান্তর, দূরত্বে স্নেহে কখনো ঘাটতি দেখিনি। মৃত্যুর মাস পাঁচেক আগে তাঁর বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি রক্তাল্পতায় অসুস্থ। তার মধ্যেও বারবার বলেছিলেন, "লিখতে সবথেকে ভালো লাগে। রোজ লিখি। নতুন

নতুন করে ব্যাপারটাকে বুঝতে পারি।” মুখে ফুটে উঠেছিল এক অমর্ত্য বিভা।

আজ মনে হয়, ‘লিখন’, এই শিল্পরূপটির চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পৌঁছেছিলেন। যখন, কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, পরম্পরা, বক্তব্য সব তুচ্ছ করে দিয়ে ভাষা আর অনুভব বিমূর্ত উচ্চতায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে। তখন লেখক তুচ্ছ, পাঠক তুচ্ছ, সমকাল তুচ্ছ, সংসার তুচ্ছ, সমাজ তুচ্ছ, ব্যক্তিসংকট তুচ্ছ, শুধু শিল্পরূপ ডানা মেলে দেয় নীল শূন্যতায়। বিষয় নিরপেক্ষ একা শিল্পরূপ।

বরিশালের যোগেন মণ্ডল: শূদ্রের স্বদেশ-সন্ধান

স্বপন পাণ্ডা

আজ আট মাস হতে চলল, দেবেশ রায় আমাদের হাত ছেড়ে চলে গেছেন। এদিকে ডিসেম্বর এসে পড়ল। অনেক বছর পর এই প্রথম তাঁকে জন্মদিনের প্রণাম জানাতে যাওয়া হবে না। বল্মীকের চার তলার ওই দক্ষিণের বারান্দা, শীতের সকাল, কাকলিদির পরিচর্যাজাত মরসুমি ফুলেদের ছায়া, গীতবিতান হাতে দেবেশদার নিবিড় বসে থাকা—চিরতরে এসব চলমান দৃশ্য এখন স্থির, অ-জঙ্গম। এবারের জন্মদিন হয়ে উঠল তাঁর মৃত্যুদিনের স্মরণিকা। ব্যক্তিগত ভাবে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে গেছে আমার। তবে আস্তে আস্তে শোকের ঝড় শমিত, আঁকড়ে ধরেছি তাঁরই বইপত্র। তাক থেকে মে মাসে নামিয়েছিলাম প্রিয় ৪টি বই। এগুলি আগে একাধিক বার পড়েছি, এখন ফিরে পড়ে চলেছি এবং আবারো পড়ব—আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, প্রতিবেদন সমগ্র আর বরিশালের যোগেন মণ্ডল। শেষের এই বইটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই একেবারে যথার্থ মহাকাব্যিক উপন্যাস নিয়ে আমার মুগ্ধতা পাঠকবন্ধুদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নেবার জন্য আজ আপাতত এই এক ভাঙাচোরা লেখার সামনে দাঁড়ানো।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘দেবেশকে নিয়ে ব্যক্তিগত’ শিরোনামের একটি

লেখায় 'আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক' বলে দেবেশ রায়কে সম্বর্ধিত করেছেন। লেখাটি বেরিয়েছিল 'কঙ্ক' পত্রিকার দেবেশ সম্মাননা সংখ্যায়। শঙ্খ ঘোষের কথাটার ঠিকঠাক ভার যেন এখন এতদিনে একটু আধটু বুঝতে পারছি, বিশেষত বরিশালের যোগেন মণ্ডল পড়তে গিয়ে। ১০৫৯ পাতার এই মহাগ্রন্থ বেরিয়েছিল ২০১০ সালে। তার আগে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় দু-এক টুকরোই মাত্র বেরিয়েছিল। একটার কথা মনে পড়ছে সাহেবগো বেঙ্গল, এটা ২০০৮ সালে বারোমাসের শারদীয়তে বেরিয়েছিল। আর একটা টুকরো বেরিয়েছিল ওই বছরের আজকাল শারদীয়তে। অবশ্য এটা এমন এক বই, যা কিছুতেই খণ্ড খণ্ড করে পড়া যায় না—অখণ্ড বইটি তার বিপুল আয়তনসহ হাতে না নিতে পারলে এর গ্রন্থগাম্ভীর্য মালুম হয় না। বিশ্বসাহিত্যে অল্প কিছু বই এমন হয়। এমনই হয়।

অথচ, বরিশালের যোগেন মণ্ডল বইটিকে পৃথিবীব্যাপী যে বাংলা ভাষার পাঠক ছড়িয়ে আছেন, তাঁরা যেন এখনো চিনে উঠতে পারেননি। এ বই নিয়ে তাই যতখানি উদ্দীপক আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের প্রত্যাশা আমাদের ছিল, তাও পূরণ হয়নি। সরকারি বেসরকারি কোনো পুরস্কারে বইটি সম্মানিত হয়নি। যদিও এসব আমার ব্যক্তিগত খুবই তাৎক্ষণিক আক্ষেপ। বিশ্ব সাহিত্যের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে, প্রাক-ইতিহাসে এমন কত মণিময় গ্রন্থ ধীরে ধীরে শতক সহস্রাব্দ পার হয়ে আলো ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে সুদূর সময়ের দিকে। এ বই, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস সেই সরণিতে তার অভিযাত্রা বজায় রাখবে। এ বই নিয়ে যে-সব লেখা মনে ধরে, তার মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যোগেন মণ্ডলের একাকিত্ব অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। সম্প্রতি তরুণ বন্ধু, গবেষক সৌরভ রায় একটি দীর্ঘ লেখা তৈরি করেছেন এ বই নিয়ে। আমার দুঃখ, এ লেখাটি দেবেশদার পড়া হয়ে উঠলো না। খুব খুশি হতেন। নিজের

লেখা নিয়ে তিনি কথা বলতে খুব একটা পছন্দ করতেন না। তবে, ব্যতিক্রম এই বই। এটি বেরোনোর বোধহয় মাস দুই পরে এক সকালে গিয়েছি, কথা বলতে বলতে একটা ফোন এল। অন্তত তিরিশ মিনিট। এদিকের কথা শুনতে শুনতে বুঝলাম বরিশাল নিয়ে কেউ ওপ্রান্তে মুগ্ধতা প্রকাশ করেই চলেছেন। সবশেষে এই বলে ফোন রাখলেন দেবেশদা—আপনি যখন এতটাই বলছেন, বেশ কনফিডেন্স পাচ্ছি। ফোন রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, অশোক সেন।

অন্তত দু তিন বার বলেছেন, খুবই ব্যক্তিগতভাবে, তবে আজ আর তা ব্যক্তিগতে রেখে লাভ নেই—বলেছেন, এ উপন্যাস কেউ ধরতেই পারেনি। ধরতে গেলে... চুপ করে যেতেন দেবেশদা। একদিন বললেন, রণজিৎদাকে (রণজিৎ গুহ) এক কপি যোগেন পাঠালে হয়, রণজিৎদা লিখলে... আমার অনুমান, এ উপন্যাসটিকে বার বার ইতিহাসের খুঁটিনাটি দিয়ে, তার কাল-প্রেক্ষিত দিয়ে বেশি বিচার করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের যে উপেক্ষিত মানুষটি এর অবলম্বন, সে যেন খানিক পেছনে পড়ে যায়।

যোগেন মণ্ডল মানুষটি কে? বরিশালের গৌরনদী থানার মৈস্তারকান্দির এক নমশূদ্রের ছেলে। যাদের নাকি 'একটা কাঁঠাল কাঠের পিড়ির মাপের জমিও' চাষ করার জন্য জোটে না। বাড়ির পুরুষেরা কাঠের কাজ করেন, আর মেয়েরা উচ্চবর্ণের বাড়িতে ঘরের কাজ করেন। পাঠশালা থেকে স্কুল, স্কুল থেকে বরিশালের কলেজ, সেখান থেকে কলকাতার ল কলেজ হয়ে ফিরে বরিশালেই ওকালতি শুরু করেন যোগেন। তাঁর আইনের জ্ঞান, সওয়াল করার নৈপুণ্য, আশ্চর্য বাগ্মিতায় মফস্বল শহরের উচ্চবর্ণের লোকজন পর্যন্ত মুগ্ধ। অথচ তাদের পরিবারের কেউ কখনো পাঠশালার গণ্ডি ছাড়িয়ে স্কুলেই পৌঁছয়নি। সেই যোগেন উকিল, স্থানীয় মান্যগণ্যদের অনুরোধে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের জমিদার প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল

হয়ে দাঁড়ানো মাত্র জিতে গেলেন প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে। সারা বাংলায়, ভারতে তিনি অদ্বিতীয় নজির গড়লেন, কেননা, তিনি জিতলেন সাধারণ আসনে, তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নয়। নমশূদ্র সমাজে এটা একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। এ ঘটনার ধাক্কায় ধাক্কায় সেদিনের বাংলার রাজনীতি, ভারতের রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া, নিরন্তর শূদ্রত্বের অহং সামনে রেখে শূদ্রদের প্রকৃত স্বদেশ সন্ধান করতে করতে যোগেনের ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে জার্নিই এ উপন্যাসকে মহাগ্রন্থের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে।

২০টি অধ্যায়, ১৮১টি পরিচ্ছেদ সমন্বিত এই উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির শিরোনামের মধ্যেই আছে ঘটনার গতি-প্রকৃতির আন্দাজ। শুধু রাজনীতি, ভোটপ্রচার, মন্ত্রিত্ব, দলাদলি কাজিয়া নয়, যোগেন মণ্ডলের ব্যক্তি-পরিসরের নানা মুহূর্ত তৈরি করে দেবেশ রায় ইতিহাসের বর্জ্যপাত্র থেকে এক সুঠাম সবল সমর্থ স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেন। পুর্ব বাংলার, বিশেষ করে বরিশালের গ্রামসমাজের রসিকতাতেও যোগেন ওস্তাদ। প্রতিবাদী, রসিক ও বুদ্ধিদীপ্ত যোগেন মণ্ডল বিরাট ভারতবর্ষের একটা স্থানিক বিন্দু, অথচ হাজার পাতা জুড়ে তাকে নির্মাণ করতে গিয়ে দেবেশ রায় অখণ্ড ভারত শুধু নয়, এক বিরাট বিশ্বপরিধি রচনা করে তাঁকে দেশ-কাল-জীবনধারার মধ্যে এক অপ্রতিহত আশ্চর্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন। উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম এরকম, একটু নির্বাচন করেই বলছি শুধু পাঠকের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে— যোগেন মণ্ডল: বরিশালের মেগাস্থিনিস / সাইকেলে ব্যক্তিত্ব: অশ্বিনী দত্ত ও যোগেন মণ্ডল / কংগ্রেসের পৈতে-তিলকের নখদাঁতের বদলা / কাটা জিভের ভাষা / নৌকাপথে মৈস্তারকান্দি / ফজলুল হকের বার্তা / একটা কোরাস তৈরি হওয়ার আগেই ভেঙে গেল / কংগ্রেসের হকত্যাগ ও হকসাহেবের লিগপ্রবেশের ফলাফল / শ্বশুরবাড়িতে

যোগেন / যোগেনের স্ত্রী সম্ভাষণ / উপকথাময় সেই দেশ / হবিগঞ্জে তুলসীমালা / সুভাষ ও শরৎ বোসের সঙ্গে যোগেনের দেখাশোনা / সুভাষ বোসের চাঁদসী চিকিৎসা করে যোগেন / গান্ধী সকাশে / গান্ধী মুগ্ধতা থেকে পরিত্রাণ / শিশির ভাদুড়ীর মেবার পতন / এম এন রায় / যাদুগোপাল / কলকাতা এ আই সিসি / মুসলমান: আপকান্ট্রি ও ডাউনকান্ট্রি / ধাঙড় ধর্মঘট / লাহোর প্রস্তাব: ৫ মার্চ ১৯৪০ / ঢাকায় সেনসাসের দাঙ্গা / নতুন দাঙ্গা / শ্যামাপ্রসাদের রণনীতি ও গান্ধীজীর আখেরি লড়াই / খরচের খাতায় বাংলা / বাংলার তপশিলিদের পার্টিশান / তারিক ই যোগেন / যোগেনের নভেল ত্যাগ ও স্বদেশ যাত্রা ।

এই মহাগ্রন্থ, লেখক উৎসর্গ করেছেন তাঁর শৈশবের মাতৃসমা বেণুমাসীকে। তাঁর ভাই সমরেশ রায়ের জন্মের পর তাঁদের মা এমন অসুখে পড়েন যে, লালন-পালনের সব দায়ভার বুকে তুলে নেন এই রেণুমাসী। লেখকের জবান—“এমন ভাবতে চাই এখন, এমন ভাবতে ভাল লাগে, আমরা ভাইবোনেরা শূদ্রাণা-পালিত বংশ।” সেই শূদ্রাণীকে বাংলার এক শূদ্রবীরের আখ্যান যেন তর্পণ হিসেবে লিখে পাঠান দেবেশ রায়, যিনি জন্মপরিচয়ে এক বর্ণহিন্দু। যে বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধেই আজীবন লড়াই, এক অসম লড়াই লড়ে গেলেন যোগেন মণ্ডল। আর লড়তে লড়তে একদিন হয়ে গেলেন ইতিহাসের অপাংক্তেয়, বিস্মৃত এক নায়ক।

দেবেশ রায়, ১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে সীমায় ধরেছেন যোগেন মণ্ডলের আশ্চর্য উত্থানের বিবরণ, এই ১০ বছরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার নমশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন, ছিলেন ৪৬-এর সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভাতেও, মুহম্মদ আলি জিন্নার অন্তবর্তী মন্ত্রিসভাতে মুসলিম লিগের প্রতিনিধি হয়ে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীর

পদগ্রহণ করা মাত্র তিনি হয়ে পড়লেন হিন্দু ও মুসলমান দুই দিকের শত্রু, নমশূদ্ররাও প্রায় সবাই তাঁকে ত্যাগ করলেন। ১৯৫০-এ ফিরে এলেন ভারতে, না, আর কোনো নির্বাচনে তিনি জিততে পারলেন না। কংগ্রেস ততদিনে দলিত ভোটের জন্য লেখকের ভাষায়—"আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমণ্ডলীতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স - ম্ - পূ - র্ণ মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।" লেখকের এই হয়তো এক কাজ, যা ইতিহাসের অতিরিক্ত, অপাংক্তেয়, যা জাতীয়-স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া হয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলা, বিস্মৃতির ঝুল-কালি সযত্নে ছাড়িয়ে, ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজের শুকনো তথ্যের সামান্য সূত্রকে কল্পনার ঐশ্বর্যে তাকে প্রাণবান করে তোলা। দেবেশ রায় ছাড়া এ সমর্থ কাজ, ইতিহাসের এই দায়ভারকে সাহিত্যে অবিস্মরণীয় করে তোলা আর কেউ সম্ভব করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

বরিশাল হিতৈষীর অফিস থেকে যে উপন্যাস শুরু হয় যোগেন মণ্ডলের প্রার্থী হবার সংবাদ উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে, তা শেষ হবে যোগেনের করাচি যাত্রা দিয়ে। দীর্ঘ দশ বছর ব্যাপী বাংলা ও ভারতের কত অসংখ্য সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন নথির পর নথি সাজিয়ে, অথচ কোথাও, যাকে বলে নভেলাইজেশান তার ব্যত্যয় ঘটে না। অখণ্ড উপমহাদেশের নাড়ির চলন যেমন এখানে টের পাওয়া যায়, তেমনি, এক নাছোড়, জেদি ব্যক্তি যোগেনের সফলতা-নিষ্ফলতার আনন্দ-বিষাদের উপন্যাস-বিবরণ যেন সেই ঐতিহাসিক আলেখ্যকে অতিক্রম করে যেতে থাকে। এই অতিক্রমণ ছাড়া কোনো অত্যাশ্চর্য বিরাট মহান থেকে শুরু করে, তুচ্ছ তামাদি ইতিহাসও জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে না।

একেই রবীন্দ্রনাথ, ‘রাজসিংহ’ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন সাহিত্যের নিত্য সত্য আর ইতিহাসের বিশেষ সত্যের সামঞ্জস্য বিধান। দেবেশ রায়ের এই উপন্যাস, বস্তুত বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ এক উপন্যাস, আর যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত কেউ করতে চান, তাহলে তো বলব, আমাদের ভাষায় এমন উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা আগে আর কখনো ঘটেনি। খেয়াল করলে দেখবো, উপন্যাসটি যখন বেরোল, তখন লেখকের বয়েস ঠিক চুয়াত্তর। আমার সৌভাগ্য, এ গ্রন্থ তাঁকে আমি সৃষ্টি করতে দেখেছি, অনেক মুহূর্ত গিয়ে নির্বাক বসে থেকেছি, উনি লিখছেন, ইঙ্গিতে বসতে বলে কাজ সেরে বা গুটিয়ে একটি দুটি কথা বলেছেন, আর হয়তো মজা করে জানতে চেয়েছেন, শেষ করতে পারবো তো? এটা তাঁর একটি বাচিক মুদ্রা ছিল; পরক্ষণেই বলতেন, কিন্তু খুব আনন্দ পাচ্ছি।

উপন্যাসে, ওড়কান্দির ঠাকুরবাড়িতে স্নানযাত্রার মহোৎসবের বিবরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবছর এই উৎসবে অনুষ্ঠিত হত ‘নমশূদ্রবিজয় যাত্রা’। সেই পালায় রোমাঞ্চকর কাহিনি বুনে শোনানো হত শেখের সঙ্গে শূদ্রের লড়াই আর শূদ্রের হাতে বর্ণহিন্দু রক্ষার বৃত্তান্ত। যোগেন একবার এ উৎসবে যোগ দিয়ে ওই পালাগান শুনতে শুনতে হঠাৎ তার মধ্যে নিজে ঢুকে পড়ে গেয়ে ওঠে বিপরীতের গান:

শেখ আর শুদুরের একই দুশমন।
বামুন-কায়েত-বৈদ্য উচ্চ হিন্দুগণ।

এই হল যোগেনের রাজনীতি। এই উঁচু থাকের লোকেরা চায় আপদে-বিপদে শূদ্র তাঁদের রক্ষা করবে, কিন্তু সামাজিক বিনিময়ে এক গ্লাস জলপানের অধিকার, দাওয়ায় উঠে বসে এক ছিলিম তামাকের অধিকারও তাদের নেই। তাই বর্ণহিন্দুর কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা নয়, বরিশালের আর এক স্মরণীয় ভূমিপুত্র ফজলুল হকের

কৃষক প্রজা পার্টি নয়, তাঁকে শেষপর্যন্ত একা এক স্বতন্ত্র পথের সন্ধান শুরু করতে হয়। এর সূত্রপাত হয়ত হয়েছিল ল কলেজের সরস্বতী পুজোয়। পুরুত মশায় বলেছিলেন, তিনি গীতাপাঠ করতে পারবেন না, কারণ ছাত্রদের মধ্যে অনেক শূদ্র ও যবন আছে—গীতা শোনার যাদের অধিকারই নেই। যোগেন দু দিনে পুরো গীতা মুখস্থ করে নেন। মণ্ডপের বাইরে বসে তাঁর গুরুগম্ভীর গলায় গীতা আবৃত্তি করতে থাকেন একটা ছোট কাগজে লাল কালিতে মোটা করে লিখে দেন—'গীতা ফর আনটাচেবল হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস ওনলি।' নির্বাচনে জিতে এসে এই ধারণা তিনি ছড়িয়ে দিতে চান শূদ্রদের মধ্যে—আমরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, এক স্বতন্ত্র জাত, হিন্দুদের একটা জলঅচল টুকরো হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। পরের দশ বছর এই তত্ত্ব সহ তাঁর উত্থান ও অবস্থান পোক্ত করার এক দীর্ঘ লড়াই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—"শূদ্রের স্বাভাবিক আত্মীয়তা মুসলমানের সঙ্গে। শূদ্র ও মুসলমানদের দুঃখকষ্ট, আয়-ব্যয়, চাষ-আবাদ, মাছ ধরা, নৌকা চালানো, সুখ-অসুখ, চেঁচামেচি ডাকাডাকি অসুখ-বিসুখ, টোটকা-টুটকি—সবই একরকম।"

নমশূদ্রদের প্রবীণ নেতা রসিক বিশ্বাসকে ১৯৩৯ সালে মাগুড়ার দাঙ্গায় যোগেনের প্রশ্ন ছিল—"হিন্দুগ বাঁচাইতে শূদ্ররা ক্যান প্রাণ দিবে? ভয় পাবে? আমাগো সঙ্গে তো মুসলমানগ কোনো বিবাদ নাই।" পোড় খাওয়া রসিক বিশ্বাস যোগেনকে সস্নেহে বুঝিয়েছিলেন—"কথাডা বিশ্বাসের। নমশূদ্রগ এই বিশ্বাস নাই যে তারা হিন্দু না। মুসলমানগ সঙ্গে দাঙ্গায় কোনো নমো বুইঝবার পারে, স্যাও একডা হিন্দু। সেই বোঝা তো বিশ্বাস।" এই বিশ্বাসকেই লুট করে নিতে থাকে অখণ্ড ভারতের উচ্চবর্ণের রাজনীতি। তারা তো চিরকালের সংখ্যালঘু হয়েও চিরকালের ভারত-নিয়ন্তা! সংবেদনশীল সুভাষ বসুর সঙ্গে এ উপন্যাসে যোগেনের অনেক-কটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে খুবই

তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এই বিবরণ, যেখানে শূদ্র ও উচ্চবর্ণের সম্পর্ক নিয়ে যোগেনের নিজস্ব দর্শন হয়ে ওঠে সুভাষের কাছেও অনন্য। তবু, সুভাষ চাইছিলেন শিডিউলড-দের কংগ্রসের ছাতার তলায় নিয়ে আসতে। তাঁর চমক দেওয়া কথার সামনে যোগেনও খানিক থমকে যায়। সুভাষ বলছিলেন—“সারা দেশটাই পরাধীন, অপ্রেসড, ডিপ্রেসড, সাপ্রেসড। তাহলে কয়েকটি জাতের লোককে এই সব নাম দিয়ে আলাদা করা কেন। এখন আবার হয়েছে শিডিউলড। ভারতীয়মাত্রেই তো শিডিউলড ফর ফাঁসি, শিডিউলড ফর জেলখাটা, শিডিউলড ফর শাহেবের লাথি খাওয়া। যতদিন পরাধীনতা, ততদিন এসব থাকবে। পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে এগুলো দুর হবে না। একই হিন্দুধর্মের মধ্যে উচুনিচু ভেদ তো আর হিন্দুধর্মের অখণ্ডতা ও সমগ্রতা ভাঙতে পারে না। সেই সমগ্রতার কথা বলেছেন রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ।” এমন লাগসই বক্তব্য কখনো স্পষ্ট করে না বললেও, গান্ধীজীর শিডিউলড-ভাবনাও প্রায় এক। ‘হরিজন’ বলে শূদ্রদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা তৈরির প্রকল্পনার মধ্যেও ছিল ভোটের হিসেব। এঁরা সবাই চেয়েছেন, হিন্দু ভোটের অখণ্ডতা। এখানেই যোগেনের সঙ্গে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, সবার বিরোধ। সুভাষের ওইসব কথা শুনে রাতে ঘুমোতে পারেন না যোগেন। তাহলে কি তিনি ভুল পথে চলেছেন? তাঁর মনে হয় বার বার—“আমি শুদ্দুর। ওরা আমারে হিন্দু বানায় ক্যান?”

...

“আমি তো চাঁড়ালের বংশের চাঁড়াল। তোমাগো হিন্দুধর্মে তো পূর্বজন্ম আছে। কতগুলা পূর্বজন্মের চাঁড়াল আমি তার হিশাব কেউ জানে না—তাইলে আমি হিন্দুডা কোন পূর্বজন্মে ছিলাম…?”

পরের দিনই ফোন করে যোগেন পৌঁছে যান সুভাষের বাড়ি। গতকালের কথার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই জানিয়ে দেন—

“আপনাকে কে কী বলছেন, জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে স্বমুখে ও সজ্ঞানে জানাই যে আমার কিন্তু কোনো পার্টি নাই, কোনো পলিটিক্সও নাই। মানে, পার্টিপলিটিক্স নাই।” কংগ্রেসের প্রার্থীকে হারিয়েই যোগেন আইন পরিষদে এসেছিলেন, সেই ঘটনা মনে করিয়ে সুভাষ পাল্টা দেন একেবারে মজা ক’রে—“বাঃ, কংগ্রেসের অফিসিয়াল ক্যানডিডেটকে হারিয়ে জিতে এখন বলছেন আপনার পার্টি নেই, পলিটিক্সও নেই। আপনি তো প্রমাণিত অ্যান্টিকংগ্রেস।”

যোগেন বিনীতভাবে জানান—“...আমার কাছে সবার উপরে শূদ্র। হাজার হাজার বছর ধর‍্যা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাদের সবসময় একেবারে ধ্বংসের কিনারায় ঝুল্যায়া রাইখছে, পশুদের মতন।” শূদ্রের প্রতি উচ্চের এই মনোভাবের কথা প্রতিষ্ঠা করতেই যোগেন শোনান পাবনার এক ব্রাহ্মণ জমিদারের ঘটনা। এ ঘটনা বেশি দিনের না, মাত্র ১৯২৭-২৮-এর। এক শূদ্র চাষি বাড়ির পাশের আলে কয়েকটা সুপুরি গাছ লাগিয়ে, বছরে দুবার ওই সুপুরি বেচে কিছু টাকা পেত। আইনত ওটা তার সম্পত্তি নয়, সুপুরি গাছ লাগানো, সুপুরি ফলানো অত্যন্ত গর্হিত কাজ—এই অভিযোগ তুলে তাকে ধরে নিয়ে যায় কাছারির বরকন্দাজ। জমিদার, বগল থেকে তার পুরো ডান হাতটা কেটে দিয়ে বললেন—‘যা, বাড়ি যা, তোর মত শুদ্দুরের দুইডা হাত দিয়া কী হইব। “তোর যা জীবন, তাতে একডা হাতই তো বেশি।” মাথা নত করে এই আদেশ শিরোধার্য মেনে রক্তাক্ত, খণ্ডিত হাত শূদ্রটি চলে যেতে শুরু করে। দু পা যেতে না যেতেই জমিদারের ব্রাহ্মণ্য-গর্জন— “হেই চাঁড়াল, তোর কাটা হাত তুইল্যা নিয়্যা গেলি না, তোর রক্ত ছু‘ব কেডা।” এই সংলাপের পর যোগেনের মারফৎ দেবেশ রায়ের বেদনাদীর্ণ গদ্য—“সেই শূদ্র দুইপা পিছায়া হাঁট্যা, মাটিতে পইড়া থাকা তার ডাইন হাতটা তুল্যা নিয়া চল্যা গেল। তুলছিল কাটা-ডানহাতের আঙুলগুল্যা ধইর‍্যা। হাত তো

মানুষ তেমনি ধরে। তার কাটাহাতের উলটা বগল থিক্যা বড়-বড় ফোঁটায় রক্ত পড়ছিল, জমিদারের কাছারি থিক্যা তার বাড়ি পর্যন্ত তিন মাইলের কাঁচা রাস্তায়, আইলে, ক্ষেতের উপড়ানো মাটিতে, ঘাসে, খালের জলেও।" এই অন্তহীন রক্তপাত, লাঞ্ছনা, আর সুদূর একাকিত্ব কোনোভাবেই একজন শূদ্রকে 'হিন্দু'র সঙ্গে আত্মীয়তায় উৎসাহিত করতে পারে না—এই চিন্তাই যোগেন মণ্ডলকে অবিচল রাখে তার চণ্ডালভ্রাতাদের জন্য একটা নিজস্ব স্বদেশ সন্ধানে।

ঘটনাক্রম বিচার করে দেখলে দেখা যায়, সুভাষের অন্তর্ধানের পর পরই ভেঙে পড়তে থাকে যোগেনের একক ও অনন্য চিন্তা ও যুক্তির মিনার। জাতীয় কংগ্রসের অসহিষ্ণুতা, ক্ষমতার মোহ, হিন্দু মহাসভার মিথ্যা-উদ্দীপক প্রচার, ছেচল্লিশের ভ্রাতৃঘাতী ভয়াবহ দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ, জিন্নার অনড়তা আর ব্রিটিশ কূটনীতির প্যাঁচে অনিবার্য হয়ে ওঠে দেশভাগ। একা হয়ে পড়েন যোগেন। ১৯৩৭-১৯৪৭-এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তামাম ভারতের সমূহ রাজনীতি-প্রবাহকে ধরে দেবেশ রায় যোগেন মণ্ডলের অসহায় নায়কত্বের বিষাদকে শিল্পিত করে তোলেন।

একা হয়ে পড়লেও, যোগেন মণ্ডল কিন্তু তাঁর ঘোষিত রাজনীতির আদর্শ থেকে কখনও সরে আসেননি; তাই শেষপর্যন্ত তিনি বিশ্বাস রাখেন জিন্নার ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তানে। উপন্যাস শেষ হয় তাঁর করাচি যাত্রা দিয়ে, এ যাত্রা তাঁর কাছে "স্বদেশযাত্রা।" সেই স্বদেশে তিনি ভাবেন হিন্দুদের দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যাখ্যাত চণ্ডাল, তার স্বাভাবিক আত্মীয় মুসলমানের সঙ্গে শান্তিতে সহবাস করবে। গড়ে তুলবে নতুন দেশ। জিন্নার ডাকে তাই তিনি স্বাধীন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীর শপথ নিলেন। আর তার মাত্র তিনবছর পর তাঁকে ফিরে আসতে হবে ভারতে। ইতিহাস তাঁকে নিক্ষেপ করবে অতল বিস্মৃতির গর্ভে। কারণ, হিন্দু, মুসলমান আর নিজের

শূদ্রসমাজেও তিনি ততদিনে ব্রাত্য, নিঃসঙ্গ। তিনি একদা ঘোষণা করেছিলেন— “বামুন যদি তার জন্মপরিচয়ে বামুন হয়, আমিও তাহলে আমার জন্মপরিচয়ে চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব নয়।” এর মর্ম অনুধাবন করেনি তাঁর নিজের সমাজ। তাই নিজের বিশ্বাস, নিজের রাজনীতির ‘চিরঞ্জীব নাশকতা’ নিয়ে ইতিহাসের ধারা থেকে, জনমানস থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন ও একলা হয়ে পড়েন যোগেন মণ্ডল, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, বরিশালের স্থানিক ক্ষুদ্রস্মৃতি হয়েই অবসিত হয়ে যান তিনি।

জয় যোগেনো মণ্ডলো।
জিইত্যা হইছে এম-এল-ও
হরির নামের আসরে কোনো বামুন শূদ্র নাই।
জগবন্ধু প্রভু জয়।
যোগেনো মণ্ডলো জয়...

যারা একদিন, তাঁকে কাঁধে চড়িয়ে ঘিরে ধরে এই গান বেঁধে গেয়ে গেয়ে শূদ্র-উত্থানের উদ্যাপন করতো, আজ তারা কেউ নেই, সরে গেছে সব। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের। মহাভারতবর্ষের রাজনীতির মহাআখ্যান তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রত্যাখ্যানের বিবরণ আছে যোগেনের নভেল ত্যাগ, অর্থাৎ, শেষের স্বদেশযাত্রার আগের পরিচ্ছেদে। এখানে যোগেনের অনুভূতিস্রোত উপন্যাসে তাঁর নিঃসঙ্গ নায়কত্বের অভিজ্ঞান: “আমি শূদ্র, আমার নিশিদিন দিননিশি কাটে পশুর সঙ্গে, শুয়োর-কুকুর-গরুর সঙ্গে, মড়ার সঙ্গে, মানুষের শরীরের নোংরার সঙ্গে, সেই সারাজীবনের সঙ্গ আমাদের মুখের ভাষাকে করে জিভকাটা, ঠোঁটকাটা, পশুর জিভ ঠোঁট থাকে, সে তার ভাষায় সেগুলো ব্যবহার করতে জানে না, পশু জানে শুধু জিভ দিয়ে চাটতে, জিভ ঠোঁট দিয়ে লেহন করতে, দাঁত দিয়ে কামড়াতে, গলার আওয়াজে তার জিভ বা ঠোঁট বা দাঁত কোনো কাজে লাগে না, আমি

শূদ্র ...আমার ভাষা তো নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ মানে—আমার ভাষা তো শুধু আমারই ভাষা—এ ভাষাকে সেদিনের আর্য ভারত বা আর্য পাকিস্তান কেউই স্বীকৃতি দেয়নি। আজও দেয় না। সিসিফাসের মতোই হার না মানা, দেবতা-প্রত্যাখ্যাত নিঃসঙ্গ এক ট্র্যাজিক মানুষকেই প্রায় ১১০০ পাতা জুড়ে নির্মাণ করেন দেবেশ রায়। আমাদের সাহিত্যে এ কাজ বিরলের মধ্যে বিরলতম অভিজ্ঞতার শিল্পস্মারক বলে মনে করি আমি।

স্বপ্ন জাগানোর গল্প

শাশ্বতী মজুমদার

১৯৫৫ সালে প্রকাশ্যে লেখা শুরু করেছিলেন দেবেশ রায়। আর এই ২০২০ সালে লেখার টুলটি ছেড়ে, লেখার টেবিলটি ছেড়ে উঠে যান তিনি। লিখতে লিখতেই হাতের কলমটি রেখে। দীর্ঘ ৬৫ বছর সাড়ে ছয় দশক, এত লম্বা সময় জুড়ে, গল্প,উপন্যাস রচনা, তার তত্ত্ব রচনা, ছয় দশক ধরেই সাম্প্রতিকে লিপ্ত হয়ে থাকা এই শিল্পী, তাঁকে শুধুমাত্র একজন লেখক বা একজন ঔপন্যাসিক বা একজন কথাকার, এই অভিধায় বোধহয় আঁটানো যায় না। দেবেশ রায় নিজের জন্য একটা নাম ঠিক করেছিলেন, তাঁর ২০০২ সালে লেখা ‘আধুনিকতা—আমাদের আধুনিকতা—অন্য আধুনিকতা’ বলে এক প্রবন্ধের শুরুর দিকে লিখেছিলেন,

“আমার কাজ বলতে এখন একটাই—গল্প বানানো। এক সময়, কোন এক সময়, গল্প বানানোর কাজটাকেই একমাত্র কাজ হয়ত বলতে চাইতাম না। এখন এই পরিচয়টুকুকেই আমি সর্বস্ব করেছি। গল্পকার বা ঔপন্যাসিক—এইসব পরিচয়ও আমার আজকাল ভারী ঠেকছে। ইংরেজিতে ‘স্টোরিটেলার’ কথাটির মধ্যে, একটু ইতিহাস, একটু পরনিন্দা একটু আয়রনি, কোথাও একটু নিজেকে জাহির করাও আছে। গঙ্গা-পদ্মার উত্তরের ভূখণ্ডের রাজবংশী মানুষজন

এক রকম শব্দ বানান। যে মহিষ নিয়ে বাথানে যায়, সে মহিষাল। যে গান গায়, সে গীতাল। যে নদীর মানুষ, সে নদীয়াল। যে ফরেস্টেই থাকে, সে ফরেস্টুয়া। এরই নকলে আমি একটা শব্দ বানিয়ে নিয়েছি 'কথোয়াল'—যে কথা বা গল্প বলে সে কথোয়াল।''

আমাদের কালের কথোয়াল দেবেশ রায়। আমাদের কালের আমাদের দেশের এই কথোয়ালকে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে জানা, আবার অন্য দিকে তাঁর কথনের মধ্যে দিয়ে জীবনকে জানা, এক অভিযান এর মত সেই অভিজ্ঞতা। ঘোষণা করার মতো, ব্রত পালনের মতো সেই কৃত্য। যা একার করণীয় নয় শুধু। ভাগ করে না নিলে যার উদযাপন সম্পূর্ণ হতে পারে না যেন। আজ দেবেশ রায়ের 'স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত' সামনে রেখে, আমরা প্রবেশ করতে চাইবো সেই অবগাহনে। ১৯৮৮ সালে লেখা এই গল্প, 'গল্প-সমগ্র' পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। দেবেশ রায় তাঁর গল্প-উপন্যাসে আমাদের এদেশের নিজস্ব এক ধরন সন্ধান করেছেন আজীবন। তিনি বলেন, "নতুন আধুনিকতা সন্ধান এক ইতিহাসের দায়।" আমাদের আধুনিকতা সংক্রান্ত প্রবন্ধটির একদম শেষের দিকে তিনি একটা কথা লিখেছিলেন,

"আমাদের এক নতুন আধুনিকতার দরকার—আধুনিকতার পরের আধুনিকতা। এই নতুন আধুনিকতা কতকগুলি চিহ্ন বিশিষ্ট, কতকগুলো ভঙ্গিতে পরিচিত, কতকগুলো আঙ্গিকে মুদ্রিত নয়। এমন হতে হবে যে, ইউরোপীয় আধুনিকতা আমাদের যে সংস্কৃতিকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়েছে, তার কিছু টুকরো ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা এক নতুন নির্মাণ পদ্ধতি খুঁজে বের করব।"

কাহিনি বলার যে নিজস্ব ধরন আমাদের দেশে ছিল, পাঁচালী, কীর্তন, কবিগান কথকতায় ছড়ানো, দু'শো আড়াইশো বছর আগেও সেইসব কথকেরা ছিলেন। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চেপে বসে তাকে

প্রায় নিঃশেষিত লুপ্ত করে দিয়েছে। মান্যভাষার কথন বিবরণীই একতম হয়ে উঠতে চেয়েছে। তিনি বলেছেন,

"আধুনিকতার পরের যে নতুন আধুনিকতার কথা আমি ভাবছি, তা কোন খোড়া তত্ত্ব নয়, তা কেন্দ্রিকতাকে অস্বীকার করা এক পরিধিকে সত্য করে তোলার স্বকীয়তা। কেন্দ্রহীন পরিধি—এমন কল্পনার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। এই স্ববিরোধী দ্বন্দ্বকেই আমি খুঁজছি—আমাদের এই এখনকার, এই বর্তমানের দ্বান্দ্বিকতা।"

দেবেশ রায় তাঁর গল্প উপন্যাস লেখার মধ্যে দিয়ে, গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কথক স্বরূপে গল্প উপন্যাসের বাইরের নানা কথায় নানা লেখায়, আমাদের স্বদেশের জীবনের নানা তলে জড়ানো মেশানো, শিল্পরূপ এবং তার তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। যা একান্তভাবে আমাদেরই। আমাদের সাহিত্যের ভাষায় শুধু নয় জীবনযাপনেও, বিশেষত মান্য স্তরে শব্দ থেকে অর্থ খসে গেছে। শব্দ ও অর্থের অনন্য নির্ভরতার জোর ভেঙে গেছে। লোকায়ত বচনের সজীব বলিষ্ঠতার স্পর্শে তাকে সঞ্জীবিত করার, তাতে জীবনের তাপ সঞ্চারের দায় তো আধুনিক কথাকারের। একজন আধুনিক মানুষ, নিজেকে প্রকাশ করতে নিজের দেখা ও বোঝা দিয়ে আরো বহু মানুষকে স্পর্শ করতে চান যিনি, সময়ের সংলগ্ন থেকে তাকে বুঝে নিতে চান, বাঁচার পক্ষে হাঁটায় তন্ন তন্ন করে সমকালের জটিল তলগুলিকে মেলে ধরেন যিনি, আমাদের মাতৃ ভাষায় তিনিই দেবেশ রায়—আমাদের কথোয়েল। গল্পের, উপন্যাসের, তার আখ্যান কথনের ভাষা যিনি অর্জন করেছিলেন জীবন-জাপনের মধ্যে দিয়ে। গল্পসমগ্র সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সে কাহিনি তিনি লিখেছেন—

"...জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনে বিধৃত প্রকৃতি, রাজবংশী বাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের লোকজন, ফরেস্টের গাছপালা, জঙ্গল পশু-পাখির

ভুবনে আমার অধিকার কায়েম হতে শুরু করল।”

১৯৬০-’৬২ সালের কথা বলেছেন, লেখক এখানে।

“রাজনীতির অজস্র দৈনন্দিন কাজে আষ্টেপৃষ্ঠে লিপ্ততা ছাড়া এ অধিকার আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল। কারণ এ কোন ভ্রমণের অধিকার নয়, এ কোন দর্শন-শ্রবণের অধিকার নয়, এ এক জনপদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়া, সেই জীবনযাপনের ইতিহাস ভূগোল এর সঙ্গে সেঁটে থাকা। আমার আর কোন উদ্ধার ছিল না। বা আমার সেই ছিল একমাত্র উদ্ধার।”

“এটা একদিনে ঘটেনি, এক বছরে ঘটেনি, একটা বা দুটো ঘটনায় ঘটেনি। এটা কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ব্যাপারও নয়। বা এমনও নয় যে, সেটা ঘটা আমার জীবনে শেষ হয়ে গেছে। বছরের পর বছর অজস্র গ্রন্থিতে এমন এক বিদ্যুৎ-সংবহন ব্যবস্থার ভিতর আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, যার বাইরে আমার আর কোন প্রজ্জ্বলন নেই, কোন শিহরণ নেই। আবার অন্যদিকে জলপাইগুড়ির সেই লোকজীবনই যেন এখনো আমার গল্প উপন্যাসের পরীক্ষা ভূমি—তা সে ঘটনা বা চরিত্র ভারতবর্ষের যে অঞ্চলেরই হোক না কেন।”

আসলে স্থান-কাল স্বকীয়তার অনুপুঙ্খতে নির্দিষ্ট, সজীব গোটা জীবনের আখ্যান নির্মাণ করেন তিনি। ভূগোল, জলহাওয়া, বৃত্তি ও পেশা, বিশ্বাস,জন্ম-জন্ম ধরে ধারাবাহিক বাঁচা, কখনো সকল আকাঙ্ক্ষা সত্বেও বাধ্যতার মরণ, ভাষার স্থানীয়তা, লোকপ্রচল, প্রবচন আর তার সঙ্গে প্রতিরোধ, সমাবেশ, সক্রিয়তা—এসব মিলে স্থান-কালের বহমান বাস্তবতার নান্দনিক রূপ পরিগ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়, তাঁর আখ্যানে। এই সময়ে, এই দেশে ব্যক্তির বেঁচে থাকার এক অমোঘ দৃশ্যতা নির্মাণ করেন তিনি যা দাঁড়াতে চায় আবার সুনিশ্চিতভাবে ইতিহাসের শিকড় সংলগ্ন হয়ে।

এই গল্পে 'নুন ভাত খাওয়া গাঁও' মূর্তি নদীর ধারে পাহাড়ের ঢালে। এই গল্পের পাঠে যে আখ্যান জগত তৈরি হয়ে আছে, সেখানে বিবরণ আর সংলাপ, প্রায় কিছুই যেন লেখকের নিজের নয়। এই নুন ভাত খাওয়া গ্রাম, তার মুখের ভাষা, সেই লোকায়ত নিত্যতা মাখা সংলাপময় আখ্যানের মধ্যে দিয়েই বোনা এ গল্প। কিন্তু গল্পের পরতে পরতে লেখা থাকে লেখকের অতিনির্দিষ্ট অভিপ্রায়। ফলে 'নুন ভাত খাওয়া গাঁ'য়ের গণেশ আর সেই গাঁয়ের মেয়েদের দিয়ে তৈরি হওয়া যে আখ্যান, যে স্বপ্ন জাগরণের আখ্যান তা দেবেশ রায়ের, আমাদের কথোয়ালের ইস্তেহার হয়ে ওঠে যেন। এই গল্পের গণেশ বর্মন, যে মানুষের হাতের ফলন, মানুষের ক্ষিদের মুখে নিয়ে আসবার জন্য লড়াই করেছিল, তার গল্প। কিন্তু সেই গল্প শুধু বোধ হয় তার গল্প নয়। গণেশ লড়াই করেছিল তারপর তার জয় হয়েছিল। সে নেতা হয়েছিল, সে পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছিল। তারপর ক্ষমতা'র অসীম এক ক্ষেত্রে সে স্থিতু হয়। সূর্যোদয় সূর্যাস্তি, আবার সূর্যোদয় আবার সূর্যাস্তি, পঞ্চায়েতে যাওয়া গ্রামের মুখিয়া হয়ে থাকা। সেই দৈনন্দিন থেকে গণেশ ক্রমে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। শক্তিমান গণেশের দৈনন্দিন আজ হয়ে উঠেছে এই জীবন। আর সেই শক্তি ও ক্ষমতার বলিষ্ঠ ধৃতি থেকে কখন অলক্ষ্যে তার স্বপ্ন খসে গেছে। যে স্বপ্নই তাকে চালিয়েছিল।

এক ভোর না হওয়া ভোর, কুয়াশামাখা ভোরেরও আগের ভোরে, নিজের ঘরের দরজা খুলে নিজের দাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় গণেশ। তার বিশাল খাড়া চাঁপা গাছের মতো দেহটা যেন ভেঙে পড়তে চায়। আর ভেতর থেকে গোঙানির মত চিৎকার বেরিয়ে আসে—

"ভোজি, ভোজি গে—ভো-জি-গে-এ।" তার বড় বৌদিকে

ওরকম স্বরে ডাকতে শুনেই, সে নিজে বোঝে সে কেঁদে উঠতে চায় আর তার বড় বৌদিও বেরিয়ে আসে দ্রুত। বলে, "কি হইছু তোর গণেশ? সাপে কামড়াইছু? সাপ?" গণেশ হাঁ করেই ছিল। হাঁ মুখটাই নাড়িয়ে বোঝায়, না সাপ নয়। "ভয় পাইছু? গণেশ ভয় পাইছু? নিশ্চিৎ ভয় পাইছু।"

এখানে কথক স্বরূপে লেখকের বিবরণ,

"তখন আকাশের দিগন্তে নতুন ঘাসের মতো আলো। গাছের মাথায় মাথায় অন্ধকার গূঢ়। স্রোত ঢেকে ফেলে নদীর খাদ তখনো অনেক উঁচুতে উঠে আছে। বাড়ির মোরগটাও ডাকেনি। চাঁপা গাছের পাখি পাখোয়াল ডাকার শব্দ তোলেনি। সেই সময় কুয়াশা ভেঙে ভোজি আর তার মাঝখানের মাটি টুকুর ভিতর ভেঙে পড়তে পড়তে গণেশ বর্মন তার হাঁ করা মুখটাকেই, উপরে নিচে দুলিয়ে জানায়, হ্যাঁ ভয় লাগছে।"

এই গণেশ বর্মন উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম 'নুন ভাত খাওয়া' গ্রামের একদা সংগ্রামী নেতা, আদিবাসী মানুষজন সেখানে, সেই গ্রামের মুখিয়া গণেশ বর্মন। তার মা নেই, বাবা নেই, দাদাও নেই। আছে একমাত্র ভোজি, আর আছে গোটা গাঁয়ের সব মানুষ। সেই গণেশ বর্মণ কাটা চাঁপা গাছের মতো এলিয়ে যায়। তার মাথাটা কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভোজি যেন গুন গুন করে গান গেয়ে উঠতে চায়। তার ভিতর থেকে তার স্মৃতি ঝরিয়ে গানের সুর তৈরি হয়ে ওঠে। আর গণেশ কেঁদে ওঠে। জোরে কেঁদে ওঠে। ভোজি জিজ্ঞেস করে— "স্বপন দেখেছু গণেশ? স্বপন দেখেছু রে? তেষ্টা পাইছে? জল খাবু?" এতসব প্রশ্নের পরে, সেই প্রায় না হওয়া ভোরের অনেক পরে আলোফোটা সকাল বেলায় অবশেষে গণেশ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। তার এই কান্নার চিৎকারে চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয় তার গ্রামের মানুষ। কেউ বোঝে না কোন

সর্বনাশের মুখে এসে তারা উপস্থিত হয়েছে। কারণ তাদের নেতা, যে তাদের লড়াইয়ে জিতিয়েছে, যে তাদের আজকের জীবন উপহার দিয়েছে, তাদের নেতা, তাদের পঞ্চায়েতের প্রধান—সেই গণেশ বর্মন, কাটা চাঁপা গাছের মতো পড়ে আছে। তারপর একসময় গণেশ বর্মন নিজেই জানায় তার কান্নার কারণ—মোরে স্বপন দেখিবার ভুলে গেইছু, ভোজি। মোর আর স্বপন নাই। মোর আর স্বপন নাই। গণেশ বর্মনের আছে নিজের বলতে এই ভোজি। ভোজির ছোট মেয়ে মূর্তি। গণেশই নাম দিয়েছিল তার। সেই মূর্তির গতকাল সাধভক্ষণ হয়েছে। সাধভক্ষণের পর আসন্নপ্রসবা সেই ভাইঝির আগামী সন্তানের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছে, আগের রাত ধরে, গণেশ বর্মন। সে স্বপ্ন দেখতে পায়নি। বলবান, শক্তিমান নেতা গণেশ। এক ছোট্ট শিশু তার বুকের উপর চাপবে, খেলা করবে, এই নরম স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল। সে স্বপ্ন, সে দেখতে পায়নি। স্বপ্ন দেখতে না পাওয়ার হাহাকারে ডুকরে উঠেছে গণেশ। এই গণেশ বর্মন এক কালে স্বপ্ন নিয়েই চালিত হয়েছিল। মানুষের ফলনকে মানুষের মুখের কাছে নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্নই ছিল তার চালিকা শক্তি। জোদ্দারদের অত্যাচার, বন্দুকের গুলির আঘাত, জেলখানার দেওয়াল তার স্বপ্নকে আহত করতে পারেনি, প্রতিহত করতে পারেনি। সেই স্বপ্নের শক্তিতেই তাকে এখন বন্দুক, পুলিশ, জেলখানা, সদর সবাই ভয় পায়। ঘূর্ণীঝোরার মতো খোলামেলা, আকাশের মতো পরিষ্কার সেই গণেশ বর্মন এই গল্পের ভোরে স্বপ্ন রিক্ত—নিঃস্ব মানুষ। কোনো এক গাঁয়ের একজন মানুষের কথা, একটা লড়াকু জীবনের কথা আর ক্ষমতার অন্ধগ্রস্ততার কথা ইতিহাসের-ভূগোলের ব্যাপ্ততায় পৌঁছে যায়, আমাদের কথোয়ালের রচনায়। ব্যক্তিজীবন ইতিহাসে স্থাপিত হয় আর ব্রত যাপনের শুদ্ধতাকামী স্বপ্ন—বীজ রক্ষণের দায়, এই

গল্পের মধ্যে দিয়ে যেন বা আজকের মানুষের উপর বর্তায়।

১৯৯৫ সালে গল্পসমগ্র পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় এই গল্পগুলি রচনার সময়টাকে তুলে ধরেছিলেন,

“৮০-র দশক শেষ হতে না হতেই, প্রায় আণবিক বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ডতায় অথচ প্রায় বিস্ময়কর নীরবতায়, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক দ্রুত ধ্বংসের মধ্যে ঢুকে গেল। আর বছর তিন চারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিচয় মানচিত্র থেকে মুছে গেল। আমার চেতনার কোন অস্পষ্ট শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন এক রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল। সেই কল্পনা প্রতিদিন পুষ্ট হয়েছে এই ভারতীয় বাস্তবতার দৈনন্দিনে। ...আমাদের আস্তিক্যের বনিয়াদ ধ্বসে গেছে। বিশ্বাস বদল করে মানুষ বাঁচতে পারে না, বিশ্বাস বদল করে মানুষ বাঁচেও না। তৃতীয় বিশ্বের একটা বড় দেশে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের মধ্যে বাঁচার অধিকারে, মানুষের উপর, মানুষের সমাবেশের উপর, সমবেত বিদ্রোহের উপর, চৈতন্যের উন্মেষের উপর, মানব সত্ত্বার জাগরণের উপর অনন্যোপায় নির্ভরতা ছাড়া আমার বা আমার মতো অনেকেরই আর কোনো অবলম্বন নেই। এই অবলম্বনই লেখায়, বাঁচায়। সেই অবলম্বনটুকু নিয়েই লিখব, বাঁচব—এটাও কেবল আশাই, যে আশা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না।” সেই আশাই এই ‘স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত’ রচনা করে। যেহেতু ব্যক্তির যাপনের বাস্তবতার সম্যক উদঘাটানই তাঁর শিল্পগত অভিনিবেশের কেন্দ্রে রয়েছে তাই এই কথোয়ালের রচনা-বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে এক গভীর বিষাদ। আবার গভীর বিষাদ সত্বেও মধ্যেও একধরনের আস্তিক্যও আছে তাঁর রচনায়। যা তাঁর লেখাকে নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে বাঁচায়। দেশে দেশে, কালে কালে, প্রতিরোধ-সক্রিয়তা-সমাবেশ গড়ে উঠেছিল, গড়ে

উঠবে স্বপ্নেরই সামরথে। স্বপ্ন ছাড়া শক্তি, স্বপ্নহীন ক্ষমতা, শুভ নয়। সর্বনাশ নিয়ে আসে। নুন ভাত খাওয়া গ্রামের চাঁপা গাছের মতো খাড়া গণেশ বর্মন তাই ভয় পেয়েছে। স্বপ্নহীন জীবনের মধ্যে আচ্ছন্নতা নয় বরং সেই সর্বনাশ, সেই দুর্দৈব থেকে মাথা তোলার আশা নিয়েই, রচনা হয়েছে স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত। এই গল্পে গণশার মাথাটুকু কোলের মধ্যে নিয়ে ভোজির কান্না, ভোজির গান, ভোজির সেই গানের কথন ও গ্রন্থনা সমবেত রমণী মণ্ডলীতে সঞ্চারিত প্রসারিত হয়ে ক্রমশ ব্রতের রূপ পেয়েছে।

যখন গণশা লড়াই করেছে জোতদারের সঙ্গে, রাষ্ট্রের পুলিশের বন্দুকের সঙ্গে, জেলখানায় গেছে, সেই সব সময় এই গাঁয়ের মেয়েরা এমন কান্না কাঁদত। তারপর যখন গণশা জোরদারের কাছ থেকে এই গ্রামের জমি নিয়ে নিয়েছে, স্বাধীন করেছে এই গ্রামকে, তখন থেকে তার চলাফেরার ক্ষেত্র টুকু সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে পঞ্চায়েতে। সেই তখন থেকে গণশার স্বপ্ন খসে যেতে থেকেছে। আর সেই তখন থেকে এই ব্রত এই কান্না এই গাঁয়ের মেয়েরা আর কাঁদেনি। তাই যেন তা বিস্মরণে তলিয়ে গিয়েছিল। ভোজির একক কান্না থেকে ক্রমে যখন পরমা এসে সেই কান্না গলায় তুলে নেয়, তারপর কোলের ছেলেকে পাশে নামিয়ে রেখে কোনো নতুন মা এই কান্না গলায় তুলে নেয়। নিজের চুলগুলোকে দুই হাত দুই কনুই দিয়ে আকাশ বিদ্ধ করতে করতে কোনো মেয়ে গুছিয়ে নিতে চায়, এভাবে কোমরের কাপড়টা একটু গুছিয়ে নিয়ে এই কান্নার মধ্যে ঢুকে পড়ে কোনো মেয়ে। গণেশের আঙিনায় সমবেত সমস্ত নারী, সমবেত মাতৃকুল এই কান্না গলায় তোলে যখন, তখন এই কান্না একটা ব্রত হয়ে উঠতে চায়। সকল বিস্মরণ ঝরে গিয়ে জীবনের অংশ হয়ে যায়। তাদের সাম্প্রতিকের, তাদের দৈনন্দিনের, তাদের সেই দিনের অংশ হয়ে যেতে থাকে এই কান্না।

একটু একটু দুলে দুলে তারা কাঁদছে। তাদের সময়ের দূরত্বটা সেই কান্না থেকে সেই ব্রত রচনার সময় থেকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে তারা।

দেবেশ রায় লিখেছেন,

“মেয়েদের এই কান্নাটা যেন একটা ব্রত। যে ব্রত তারা জন্মান্তর থেকে নিয়ে এসেছে। সে ব্রত তাদের দৈনন্দিনের কাজের সঙ্গে লেগে থাকে। ভোজির কান্নায় গণেশ বর্মনের এই চাঁপা গাছের মতো পড়ে থাকাটা একটা অপ্রস্তুত দুর্ঘটনা থেকে যেন প্রস্তুত ব্রত হয়ে যায়। জন্মান্তর থেকে এই নারীরা গর্ভ নিয়ে আসে। জন্মান্তর থেকে এই নারীরা গর্ভ ভরা কান্না নিয়ে আসে। জন্মান্তর থেকে এই নারীরা গর্ভ ভরা স্বপ্ন নিয়ে আসে। এখন সেই কান্না, স্বপ্নের জন্যে কান্নাকে তারা সেই গর্ভদেশ থেকেই গলা দিয়ে তুলে আনতে পারে। ...সেই গর্ভ থেকেই তারা এই ব্রতের কান্না তুলে আনছিল। সেই জন্মান্তরে যেন তারা জানে—এ রকম স্বপ্নহীন হয়ে পড়লে কোন ব্রত যাপন করতে হয়?”

ভোজির কান্নার সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়েছিল। ভোজির কান্না থেকে ব্রতের জন্ম হয়। ...এই ব্রতেরই এখন বড় প্রয়োজন। ব্রতই ব্রতের আচার-আচরণ তৈরি করে। মূর্তিকে মাঝখানে নিয়ে, মূর্তি গণেশের সেই ভাইজি, আসন্নপ্রসবা ভাতুষ্পুত্রী, তাকে মাঝখানে নিয়ে একদল মেয়ে উঠোন পেরোতে পেরোতে ওই কান্না গলায় তুলে নিয়ে এগোতে থাকে। তারপর ভোজির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মূর্তি। ভোজি একটু সরে যায়। গণশার মাথা মূর্তি নিজের কোলে তুলে নেয়।

“মূর্তির পরনে ফোতা, তার পা ভাঁজ করা। তার ভরা মাসের ভরা পেট। গণেশ বর্মনের মাথার উপর দিয়ে ছাপিয়ে পড়ে। গণেশ বর্মনকে তার সেই ফোলা পেটের তলায় দিয়ে মূর্তি তার গর্ভের সন্তানের আন্দোলনের ধ্বনি শোনায়।”

তাদের এই কান্নায় গণেশের লড়াইয়ের জীবন, স্বপ্ন বুকে নিয়ে সংগ্রামে সক্রিয় গোটা জীবনটা একটু একটু করে আকার পায় উন্মোচিত হয়ে যেতে থাকে। আর তার সঙ্গে প্রতিপদে বারবার বারবার উচ্চারিত হয় গণশার, সাম্প্রতিকের স্বপ্ন-রিক্ত গণেশ বরমণের আমূল-কাঁপানো ভীতির কথা। 'গণশা আমার ডর খাইছেরে'। তারা গায়,

"ওরে গণশার আমার স্বপন নাই রে, গণশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে স্যা সারা জীবন স্বপন দেখিছে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে জেলখানাতে বসে স্বপ্নাছে গনশা, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে গণশার আমার স্বপন নাই রে, গণশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে এয়ান বলবান হইছে গণশা, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে স্বপন ছাড়া বলবান গনশা, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে বল আছে আর স্বপন নাইরে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে বল ছাড়া কি রাজ্য চলে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে স্বপন ছাড়া কি রাজ্য চলে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।
ওরে বলবানের স্বপন নাইরে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।"

মূর্তি তার গর্ভের ভিতরের আন্দোলন, তার আসন্ন সন্তানের নড়াচড়ার ধ্বনি গনশার কানের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। "এই শুনো তুমার নাতি পা ছুঁড়িবার ধরে, এই শুনো তুমার নাতি মাথাখান দিয়া মুকো গুঁতাছে।" তার সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্রতের উচ্চারণ—

"ওরে বল ছাড়া কি রাজ্য চলে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।"

মূর্তি তার গর্ভের প্রাক প্রসব আলোড়নের এই ধ্বনি থেকে তার কাকার মনে স্বপ্ন সঞ্চার করে দিতে চায়।

"এই শুনো, তুমার নাতিখান পাশ ফিরোছে—
ওরে বলবানের স্বপন নাইরে, গনশা আমার ডর খাইছেরে।"

'নুন ভাত খাওয়া' গাঁয়ের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বাইরের আঙিনা, তারপর পাহাড়, তারপর নদীর ওপরে ছড়িয়ে যেতে থাকে এই নতুন

ব্রত, গণেশের ভিতরের আঙিনায় জন্ম হওয়া নতুন ব্রত। সেই তার আসন্নপ্রসবা ভাতুষ্পুত্রীর গর্ভের আলোড়ন থেকে জন্ম হওয়া নতুন ব্রত, শক্তিমান মানুষটিকে স্বপ্নে ফিরিয়ে আনবে। আবার সে স্বপ্ন দেখবে। নাতি তার বুকের উপর শুয়ে কি খেলা খেলছে।

দেবেশ রায় লিখেছেন "এমন শক্তিমান যদি স্বপ্নহীন হয়ে যায়, তাহলে তো সমস্ত স্বপ্নহীনরা শক্তিমান হয়ে উঠবে, সে দুর্দৈব ঠেকাও। গর্ভের আলোড়ন শোনো, স্বপ্নে জাগো স্বপ্নে জাগো।"

এই নারীরা জন্মান্তর থেকে গর্ভ নিয়ে আসে। এই নারীরা জন্মান্তর থেকে গর্ভ ভরা কান্না নিয়ে আসে। সেই গর্ভের কান্না দিয়ে এই নারীরা এখন স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত পালন করছে। এই স্বপ্ন জাগরণের ব্রতের গ্রন্থনা, আখ্যান বিবরণ, শিল্প হয়ে উঠেছে আমাদের অলক্ষিত দৈনন্দিনের ব্যক্তিকতা মানব ইতিহাসে উন্নীত করে। ১৯৮৮ সালের এ গল্প আজকের বাস্তবতায়ও, ভীষণ রকম প্রত্যক্ষতা নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। অনুপুঙ্খতায় ব্যক্তিক, স্থানিক এই গল্প দৈনন্দিনে ভর করেই যেন, হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিকতম দৈনন্দিনেও সংলগ্ন। গণেশ বর্মন নামক ব্যক্তি উত্তরবঙ্গের পাহাড় নদী জঙ্গলের একান্ত স্থানীয়তার ভাষা ভঙ্গি আচরণ সমেত সুনিশ্চিতভাবেই ইতিহাসের শিকড়ে সংলগ্ন থেকেও ভবিষ্যতের যাপনে সজীব সংযোগের বিস্তার পেয়েছে। আজ আমাদের মনে হচ্ছে আমাদেরও স্বপ্ন-জাগরণের সময় এসেছে। স্বপ্নহীন এক শক্তিমত্তার চাপে আমরা প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছি। স্বপ্নে জাগতে হবে। স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত উচ্চারণ করতে হবে আমাদের। আমাদের কথোয়াল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন সেই রসদ। তাকে গ্রহণ করতে হবে সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে। সার্থক হবে শিল্প রচনা। সার্থক হবে কথোয়ালের স্মৃতি। সার্থক হবে আমাদের জীবন। সার্থক হবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

কেলুচরিতমানস

শান্তনু সরকার

কেলু, কেলুকে নিয়ে আমাদের কথা। দেবেশ রায়ের 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' নামক আখ্যানের কেলু। দেবেশ রায়ের মৃত্যুর পর কাদাখোয়া, বাঘারু, কেলু এদের নিয়েই তো কথা বলব। কেলুকে নিয়ে কি কেউ আগে কোনো কথা বলেনি? নিশ্চয়ই বলেছে। তীব্র মেধাবী আলোচনা করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বাংলা উপন্যাসে 'ওরা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে। কিন্তু কেলুকে নিয়ে কি আর নতুন কোন কথা বলা সম্ভব নয়? আর কি নতুন কিছু বলার নেই?

'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' আখ্যানের শুরুতে যে গ্রন্থবন্ধন আছে সেখানে আখ্যানকার দেবেশ রায় আমাদের জানান যে, বৈচিত্র আর আয়তন আর জটিলতার ভয়ে কেলুর আখ্যান তিনি বাদ দেননি। কেলুর আখ্যান বাদ দিলে রাধিয়ার আখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আর রাধিয়ার আখ্যান বাদ থাকলে পাড়ারিয়ার কাহিনিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আর পাড়ারিয়ার কাহিনি অসম্পূর্ণ থাকলে তো 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'-ই রচিত হয়না। আমরা দেবেশ রায়ের 'কেলু'কে অনুসরণ করে 'কেলুচরিতমানস' কি রচনা করতে পারি?

আখ্যানকার দেবেশ রায় কেলুকে অনুসরণ করেন দশ বছর ধরে। ন্যূনতম পাঁচটি পত্রিকাতে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে আখ্যান বুনে চলেন

সেই দীর্ঘ সময় কালের মধ্যে তিনি গ্রন্থবন্ধন ও গ্রন্থমুক্তি ছাড়াও আটটি আখ্যান রচনা করেন। যা আমরা 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' নামে উপন্যাসে বা আখ্যানে পেয়েছি। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেন সমাজের এমন এক অংশের এমন এক মানুষকে যার দেহাত বুলির একটি বর্ণও সম্ভবত তিনি জানেন না। তাদের স্বরলিপির একটি সংকেতও তিনি বোঝেন না। কোন কথার কী অর্থ, কোন বাকশৈলীর কী তাৎপর্য--সমস্তই তাঁর নাগালের বাইরে। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন এই রচনাটিতে আমি প্রায় না-জানা ভুগোলের, না-জানা এই মানুষদের মধ্য দিয়ে কি কোনো কথা তৈরি করে তুলতে চাই? এই ভূখণ্ড, এই মানুষ কি আমার সেই কথার উপলক্ষ মাত্র? তিনি নিজেই আবার উত্তর দেন, না; আমার তেমন কোন কথা থাকতে নেই।

ঔপন্যাসিকের এই স্পষ্ট ঘোষণার পরও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন শেষ হয় না। কোনো কথা থাকতে নেই কেন? সে কথা কি আধিপত্যের ভাষায় গড়া? বড়বেশি যৌক্তিক? স্পষ্ট? গোপনতাহীন? অতিকথাহীন? তাই কি তিনি নিজের বদলে 'অপর'-এর কথা, অন্যের কথা, কেলুর কথা, বিশ্বনাথের কথা শুনতে চান ও শোনাতে চান? সে কারণেই তিনি ভাষার ক্ষেত্রে আধিপত্যের অন্যতম বড় যে জায়গা, শব্দের সঙ্গে সামাজিক অর্থের সম্পর্কের যে নিয়ন্ত্রণের জায়গা, দ্যোতকের সঙ্গে দ্যোতিতের একমাত্রিক সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে অর্থের জগৎকে নিয়ন্ত্রণের যে আধিপত্য তাকেই প্রশ্ন করে বসেন? তবে কি তিনি রাষ্ট্র, শব্দ, আধিপত্যের শব্দ, আধিপত্যের ভাষাকে প্রতিরোধ করতে চান? আমরা এই প্রতিরোধের বয়ানই তো পাই কেলুর চলার মধ্যে দিয়ে, কেলুর শব্দসন্ধানের মধ্যে দিয়ে। আখ্যান জুড়ে একের পর এক অন্তর্ঘাত ঘটে চলে। আখ্যানকার অন্তর্ঘাত ঘটান শব্দ

এবং অর্থের তথাকথিত অটুট জোড়ের যে আধিপত্যকামী নির্মাণ সেই প্রতিস্থানিকতায়। আখ্যানকার এই অন্তর্ঘাত ঘটান অর্থের বিকল্পহীন নির্দিষ্টতার বিপরীতে অনির্দিষ্টতা'র সাহায্যে। এক-অর্থ সর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের শৃঙ্খলার ভেতর বহুবচনের আক্রমণ ঘটিয়ে, একমাত্র অর্থের বদলে অর্থহীনতা দিয়ে। তবে তিনি এই অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে চলেন নথিভুক্ত শব্দসমূহ, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থসমূহের প্রতি এক বিশ্বাসের আবরণে এবং এক আপাত আনুগত্যে, যা শেষ বিচারে ছদ্ম আনুগত্য। অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে চলেন দ্যোতক ও দ্যোতিতের আধিপত্যের সম্পর্কের মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। যেহেতু বিশ্বাসের আবরণ মাত্র, যেহেতু আপাত আনুগত্য শুধু, যেহেতু ছদ্মবেশ—তাই আখ্যানকারের লড়াইয়ের, সংঘর্ষের কৌশল সরাসরি মুখোমুখি যুদ্ধের কৌশল নয়।

আখ্যানকারের ভাষায়, যার কোন একটি ভঙ্গি পরবর্তী ভঙ্গির ভূমিকা নয়। তার ভঙ্গি দেখে অনুমান করাও যায় না সে এরপর কী করবে? কেলুকে অনুসরণ করার এটাই সবথেকে বড় প্রত্যাখ্যান। এই পূর্বাপর সম্পর্ককে বারবার ভেঙে পড়তে দেখা। পাড়ারিয়া থেকে কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র পর্যন্ত—দীর্ঘ এক পথ কেলু পাড়ি দেয়। এই পাড়ি দেওয়ায় কেলুকে অনুসরণ করতে করতে আমরা বারবার পূর্বাপর সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি। আমরা কার্যকারণ সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি। রাষ্ট্রের কাছে, নিয়মের কাছে, যুক্তির কাছে এই আনপ্রেডিক্টেবলরাই তো সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ, যার কোন একটি ভঙ্গি পরবর্তী ভঙ্গির ভূমিকা নয়। বস্তুবিশ্বের সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণরূপে ব্যঞ্জনামুক্ত করে একেবারে নির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত করতে না পারলে তো আধিপত্যের ভিত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। এই অন্তর্ঘাতের ফলে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নানারকম নাকাল হওয়াও আমরা প্রত্যক্ষ করি। যখন স্টোনম্যান সন্দেহে গ্রেফতার

কেলুর জবানবন্দি নিতে কালঘাম ছুটে যায় থানার ছোটবাবুর।

কারণ তার চেনা কোনো ছকেই কেলুকে মেলাতে পারেন না। কেলুর কোন্ শব্দের কী অর্থ, কোন্ ভঙ্গির কী মানে—কিছুই আঁচ করতে পারেন না ছোটবাবু। আর পারবেনই বা কী করে! রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থানার ছোটবাবুর ভাষা বা চিহ্নের যে জগৎ তাথেকে কেলুর জগৎ তো একেবারেই ভিন্ন। আখ্যানকার নিজেই তো বলেন, ছোটবাবু যতই কেলুর প্রতিদিনের ভ্রমণের একটি ছক বের করতে চান না কেন, কেলু সে ছক ভেঙে দেয়। ছোটবাবু কেলুর রাত্রির নিদ্রার একটা নির্দিষ্টতা যতই বের করতে চান না কেন, কেলু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অন্য ফুটপাতে চলে যায়।

থানায় শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা চিহ্নিত, একটা অন্ধগলিরও নাম আছে, নম্বর আছে। থানায় রাস্তার প্রত্যেকটি পোস্ট চিহ্নিত। সেটা ফোনেরই হোক, লাইটেরই হোক আর ট্রাম কোম্পানিরই হোক। থানায় প্রত্যেকটি বাড়ি চিহ্নিত। প্রত্যেকটি বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর চিহ্নিত। থানায় রাস্তার পিচ বা ঢালাই পর্যন্ত চিহ্নিত। এত চিহ্নবদ্ধ শহরের একটা থানার ছোটবাবু কী করে কেলুকে সেই চিহ্নের সীমানার মধ্যে আনবেন? যে কেলুর কোন চিহ্নই নেই। বড় বেশি চিহ্ন নির্ভর আধিপত্যের ভাষার কাছে সত্যিই তো কেলুরা চিহ্নহীন। তাই তো উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়ে কেলু এক লাগসই শব্দের সন্ধান করে যায়, যে শব্দে সে আশ্রয় পেতে পারে।

আমাদের ভাষাবদ্ধতার জ্ঞান এই অবস্থায় থমকে যায় যখন দেখি কোনো শব্দ তৈরি হয়েছে অথচ তার আশ্রয় গড়ে ওঠেনি, দ্যোতক তৈরি হয়েছে অথচ তা কোনো কিছুই দ্যোতিত করছে না। আখ্যানে দেখি পুলিশ তার শব্দতত্ত্ব দিয়ে একটা শব্দ বানিয়েছে—'স্টোনম্যান'। কিন্তু শব্দটা এত আবছা তা দিয়ে পুলিশের কাজ বেশি দিন চলে না। তাই তারা তৈরি হয়ে উঠেছিল এই শব্দটির এক ও একমাত্র শ্রেণিকে

বানিয়ে তুলতে বা খুঁজে বের করতে। আর উল্টোদিকে কেলুর যে শব্দতত্ত্ব সেই শব্দতত্ত্ব নিয়ে সে না জেনে স্রেফ আন্দাজের ওপর ভর দিয়ে স্টোনম্যান শব্দটির দিকে হেঁটে যাওয়ার মন তৈরি করে হয়ে ওঠে এই শব্দটির এক ও একমাত্র মানুষ। এইভাবে প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসে পুলিশের বা রাষ্ট্রের বা আইনের শব্দতত্ত্ব বারবার আতান্তরে পড়ে। আতান্তরে কি শুধুই রাষ্ট্রের শব্দতত্ত্ব পড়ে? পুলিশ পড়ে? আমরাও কি পড়ি না?

ঔপন্যাসিক কেলুকে কি সমস্ত আখ্যান জুড়ে একভাবেই দেখতে পান, আমরা কি একই কেলু পাই? পাড়ারিয়ার যে কেলু, সে কেলু তো বদলে যায় কলকাতায় এসে। পাড়ারিয়াতে গ্রামের মানুষ কেলুকে একইভাবে তাদের আশ্রয় হিসেবেও ভাবে। কবে বৃষ্টি হবে, তার খোঁজ দিতে পারে কেলু। সাধারণ গ্রামের মানুষ যা তাদের প্রতিদিনের চোখে দেখতে পায় না তা কেলুর চোখে ধরা পড়ে বলে তাদের বিশ্বাস। কেলু সেখানে যূথবদ্ধ সামাজিকতার এক ধরনের প্রকাশ। কেলু সেখানে পাড়ারিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে এক ‘হোলি ম্যান’। কেলু সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু সেই কেলু যখন কলকাতায় আসে তখন সে বদলে যায়। সে কি বদলায়? নাকি তাকে কীভাবে দেখব, কীভাবে গ্রহণ করব, সেই দেখা, গ্রহণ করা বদলে যায়?

কেলুকে ঔপন্যাসিক পাড়ারিয়াতে নিয়ে যান ধর্ষণের রাতে। কেন নিয়ে যান? কারণ তার আগের জীবনে কেলুর যে পাড়ারিয়াকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট পরিধিতে ভ্রমণ এবং বারবার নানানভাবে পাড়ারিয়াতে ফিরে যাওয়া, সেই ফিরে যাওয়াকে আটকাতে একেবারে পাড়ারিয়া ত্যাগ করতে, সেই ত্যাগ নিশ্চিত করতে ঔপন্যাসিক এক ধরনের যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্কের সাহায্য নেন। ধর্ষণ দেখার পর কেলুর কাছে পাড়ারিয়ার আর কোন অর্থ থাকে না। আমরা কেলুকে আবার পরে আবিষ্কার করি কলকাতাতে। যখন সে শুধুই শরীরী কেলু।

আমরা কোন কেলুর ‘চরিতমানস’ রচনা করব? আমাদের আধুনিকতা শিখিয়েছিল আমি চিন্তা করি তাই আমার অস্তিত্ব আছে। কেলু তো চিন্তা করে না। কেলু কি সেই অর্থে সচেতন? না। ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানেই বলেন, কেলু সচেতন নয়। সচেতন হলে আর কেলু, কেলু হবে কী করে? তাহলে কি কেলুর আমিত্ব সেখানে, যেখানে সে চিন্তা করে না? আমরা তাও জানিনা। কেলু তো জটিল। আমরা যৌক্তিক কার্যকারণ খুঁজতে যাই। ঔপন্যাসিক যে যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্ক হাজির করেন তা কি শুধু উপন্যাসের প্রয়োজনে, নাকি কেলুর প্রয়োজনে? নাকি আমরা যারা পড়ুয়া তাদের প্রয়োজনে? আমাদের চিন্তা পদ্ধতি যে কার্যকারণ সূত্র পেলে আশ্বস্ত হয় অথবা যে কার্যকারণ সূত্র পেলে উপন্যাস নামক সংরূপটি আত্তীকরণ করতে আমাদের পশ্চিমি জ্ঞানতত্ত্বজাত বোধের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়না, সে কারণেই কি ঔপন্যাসিক কেলুকে পাড়ারিয়া চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করানোর জন্য কার্যকারণ সম্পর্ক হাজির করেন? আমরা জানি না।

কলকাতাতে আমরা এরপর কেলুকে পাই বেহালার হাসপাতালে। রেশনের বিষ তেল খেয়ে যখন মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল, যারা পঙ্গুত্বের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে সে-ও নিজেকে বিষ তেলের এক শিকার হিসেবে ধরে নেয় এবং বেহালায় হাসপাতালে ঢুকে যেতে চায়। সে ঢুকে যেতে চায় তার শরীরী খিদের কারণে। সে জানে না তার চারপাশে কোথায় কী ঘটছে, কী ঘটতে পারে আর সে সবের সঙ্গে তার জীবন যাপনের সম্বন্ধ কী! তবুও সে জেনে যায় কোথায় রেশনের তেল খেয়ে কারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। তাই সেও অবশ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে চায়। একই রকম ভাবে সে জেনে যায় কোথায় কার মাথায় পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে, সে-ও স্টোনম্যান হিসেবে নিজের পরিচিতি ঘটাতে চায়। সে জেনে যায় কোথায় মানুষের মিছিল চলছে, সে-ও মানুষের মিছিলে ঢুকে

পড়তে চায়। যেন এখন কেলুর কাছে হাসপাতাল, জেলখানা, মিছিল তার এক-একটা আশ্রয়।

এই যে কল্পিত আশ্রয়সমূহ, এগুলো তো সেই নিয়মবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, ব্যবস্থাবদ্ধ সচেতনতার অংশ। কোনো দেশ বা রাষ্ট্র কি এখনো থাকতে পারে যেখানে হাসপাতাল নেই, যেখানে জেলখানা নেই, যেখানে মানুষের সমাবেশ নেই? তাহলে কেলু সেই হাসপাতালে বা জেলখানায় বা সমাবেশে ঢুকে পড়তে চাইবে না কেন? তাহলে কেলু কি মিথ্যে বলে? কিন্তু ঔপন্যাসিক বা আখ্যানকার আমাদের জানান, কেলুর তো কোনো ব্যক্তিগত সচেতনতাই নেই। সে কী করে মিথ্যে সাজাবে!

কোথাও একজন মানুষ বিষ তেল খেলে কেলুর শরীরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে না কেন? কোথাও একজন মানুষ হাতে পাথর তুললে কেলুর শরীরে সেই সক্রিয়তা আসবে না কেন? এ সক্রিয়তা পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়া, কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া কি আসতে পারে না? আখ্যানকার তো গ্রন্থবন্ধনেই আমাদের জানিয়ে দেন কেলুর কাহিনি কোনো পরিপূরকতার কাহিনি নয়। তিনি আমাদের জানান তার কাহিনি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনি ও এক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাহিনি। কেলু কি তবে এক 'এম্পটি সিগনিফায়ার'! অর্থাৎ ভাসমান দ্যোতক? যার দ্যোতিতই নির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়নি।

নাকি কেলু তবে 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র একাদশ অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণ! যিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান! যিনি অব্যয়! বিশ্বরূপ ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণও তো এক ধরনের ভাসমান চিহ্নায়ক, ভাসমান দ্যোতক। সে সূত্রে কেলু এবং শ্রীকৃষ্ণ, আমি যখন 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' পড়ি, তখন পাশাপাশি চলতে থাকে। পাশাপাশি চলতে থাকে নানান অর্থে। কেলুর মধ্যে তো আমি, পাঠক হিসেবে ভারতবর্ষের রূপ দর্শন করি।

আখ্যানকার তো শুরুতেই বলেন যে, এ বৃত্তান্তের কাহিনিতে

কেলু তার সেই দূর পাড়ারিয়া থেকে কলকাতা হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যায় এক স্বয়ংসম্পূর্ণতা খোঁজে। আখ্যানকার তো আমাদের জানান আমাদের দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ এরকম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার খোঁজেই ১৯৪৭-এর পর লেগে আছে। এখানে একটি পরিসরের কথা উল্লেখ করেন আখ্যানকার। ১৯৪৭-এর পরের কথা বলতে গিয়ে তিনি পাঞ্জাবের কথা বলেন। তিনি লেখেন, পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব হয় এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার সন্ধানেরই অংশ হিসেবে। তারপর সেই পাঞ্জাবেই 'খালিস্তানি আন্দোলন' হয় ওই স্বয়ংসম্পূর্ণতা সন্ধানের অংশ হিসেবে। তাহলে কি তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই ধারণাটিকেই ব্যঙ্গ করছেন? এই দ্যোতকটিকে এক ধরনের ভাসমান দ্যোতক বা এম্পটি সিগনিফায়ার হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন? তাই কি কেলুকে যেখানে আমরা শেষ দেখতে পাই, আখ্যানের সেই অংশটার নাম 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সময় এরকম ঘটে থাকে' তিনি দেন?

আমি কেলুর কথা শেষ করবো এই অংশটির শেষ জায়গাটা পাঠ করে—"কেলু ঘুরে যায়। এবার তার মুখ পাড়ের দিকে। কেলু দেখে শেষ তটভূমিতে মানুষ তার দেশ গাঁও জিলা সদরের মানুষ, আর মানুষ মানুষের তটরেখা আঁকা হয়ে গেছে। কেলুর দেশের শেষ তটরেখা। কেলু তো ভারতবর্ষ চেনে না। অথচ সে তাকিয়েছিল ভারতবর্ষেরই এক শেষ স্থলভাগের দিকে। সেই স্থলভাগ কেলুর অজানা ভারতবর্ষ, কেলুর জানা পাড়ারিয়া। কেলু ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে ঢেউয়ের উপর জেগে ওঠে। তারপর ঢেউয়ের সঙ্গে নেবে আর একটা ঢেউয়ের মাথায় পা দেয়। কেলু দেখতে পেয়েছে রাধিয়া চিত হয়ে তার ঘরের মধ্যে পড়ে থেকে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছ। পাড়ারিয়ার তাকে কেলুকে বড় দরকার। রাধিয়ার তাকে কেলুকে বড় দরকার। সদর দেওঘর তাকে কেলুকে বড় দরকার। কেলু ঢেউয়ের

মাথায় পা দেয়। 'হাম্ আতো হো রাধিয়া, হাম্ আতো হো।' রাধিয়া আমি আসছি,আমি আসছি রাধিয়া। পরাক্রমের সঙ্গে আরো একটা ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে তার না-জানা ভারতবর্ষের দিকে তটভূমির দিকে এগোয়। তাকে এখনই পাড়ারিয়ার রাধিয়ার কাছে যেতে হবে। রাধিয়া যাবো। কেলু আরো আরো আরো ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে ঢেউ গুঁড়িয়ে ফেলে তার সমুদ্রখণ্ড থেকে ধর্ষণের পরের সকালের এক অলৌকিক খণ্ডের দিকে ছুটে যায়। এই সমুদ্র, এই মেলায় তার সাধুবাবার লিঙ্গ, দেওঘরের পাহাড় কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারবে না, আটকাতে পারবে না। 'রাধিয়া হাম্ আতো হো'।" ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে 'কালীয়দমন' করেছিল কেউ। আমাদের কি রাধিয়া নামটার মধ্যে দিয়ে কেলুর অন্য অনুষঙ্গ ভেসে আসে না? আমরা 'কেলুচরিতমানস' রচনা করতে না পারলেও, সে কথা কি ভেবেও উঠতে পারি না?

তিস্তাকে তিনি নদী নয়, ভূখণ্ড হিসেবে চিনেছিলেন

এণাক্ষী রায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ততে বাঘারু এক জায়গায় এম এল এ সাহেবকে বলছে, “জন্মাবার আগতও মোর একখান নাম আছিল।”

মোরও জন্মাবার আগত দেবেশ রায়ের নগদ চেনাশুনা। সেইলা কায় জানে!

দেবেশ রায়ের সঙ্গে আমার যোগ এক বহমান প্রবল জলধারার সঙ্গে এসে মেশা ছোট কোনো জলধারার মতো। তাঁকে আমি চিনতে শুরু করেছি তিস্তার পাড় ধরে ধরে হেঁটে আসা সাদা বালিমাখা বালিকার মতো। সে বালির সঙ্গে মিশে থাকা অভ্রকণার মতো একটু একটু ঝলকানি চিনে নিতে নিতে। (যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাঁকে চেনার আমার অনেক বাকি)। এই চেনা-অচেনার মাঝে সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটা নদী। সেটা আমার নদী। সেটা দেবেশ রায়েরও নদী। এই বোধ চমক জাগায় প্রাণে। সে নদীর নাম তিস্তা। জন্মাবধি এই তিস্তার সঙ্গে চেনাশোনা আমার।

আমি যে-দেবেশ রায়কে কাজের সূত্রে চিনি, তিনি সম্পাদক দেবেশ রায়। এরকম একজন সম্পাদক ইহজীবনে পাওয়া যেকোনো লেখকের কাছে ভাগ্যের। পরিচয়-প্রতিক্ষণ পর্বে তাঁকে না পেলেও, ২০১৭ সালের মে মাসে শুরু হওয়া সেতুবন্ধন পত্রিকার সম্পাদক

হিসেবে তাঁকে আমার পাওয়া। পত্রিকাটি শুরু হওয়ার আগেই একদিন তিনি লেখা চাইলেন। অন্তত তিন-চারটি লেখা। মনে আছে, চারটি লেখা দিয়েছিলাম। প্রথম সংখ্যায় ছাপলেন সম্বিৎ চক্রবর্তীর তিনটি গল্প। দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার দুটি গল্প। বাকি গল্পগুলোও ফেরত না দিয়ে রেখে দিলেন পরবর্তী কোনো সংখ্যার জন্য। প্রায় নতুন দুজন গল্পকারের লেখা দিয়ে দেবেশ রায়ের মতো সর্বজনগ্রাহ্য একজন সম্পাদক একটা পত্রিকা শুরু করছেন ভাবা যায় না। তিনি পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও এ ব্যবস্থা রেখেছিলেন। বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের দিয়ে লেখানো। গল্পের পাশাপাশি নিবন্ধ লিখতে উৎসাহ দেওয়া। উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করা। ব্যর্থ গল্পগুলোয় ছোট ছোট মোচড় দিয়ে কীভাবে ভালো গল্পে উত্তীর্ণ করতে হয়, তা দেখিয়ে দেওয়া। লেখার নামকরণ, উপন্যাসের পর্ব ভাগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি শিখিয়ে গেছেন। এমনকি আমার প্রথম উপন্যাস তৈরি হলে, চেয়ে নিয়েছেন নিজের কাগজে প্রকাশের জন্য।

তর্ক ভালোবাসতেন তিনি। তর্ক হতো। যেকোনো প্রশ্নের উত্তর তাঁর ঠোঁটের ডগায়। তবু মুখ দেখে বুঝে যেতেন, তাঁর দেওয়া পরামর্শ পছন্দ হয়েছে কি হয়নি! সবচেয়ে বড় কথা নবীন লেখকদের লেখায় তাদের নিজস্ব ভাষাটাই তাঁর পছন্দ ছিল। কোনো রকম পাল্টানোর কথা বলতেন না। একটা লেখা নিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বসতেন। পেন দিয়ে প্রুফ দেখতে দেখতে, বানান ঠিক করতে করতে যেতেন।

একটা কোনো লেখা না-তৈরি করে তাঁর কাছে যাওয়া চলত না।

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে একদিন বলেছিলেন, “লেখক শুধু লিখবে। লেখাটাই তার কাজ। কে ছাপবে, আদৌ ছাপা হবে কিনা, কবে বই হবে, এসব কখনো ভাববি না। বই করার ভাবনা প্রকাশকের। লেখক শুধু তার নিজের লেখাটা নিয়ে ভাববে।”

নিজের ক্ষেত্রেও যে তা মেনে চলেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর প্রথম দিকের বইগুলো।

দেবেশ রায়ের প্রথম গল্প বেরিয়েছিল জলার্ক পত্রিকায়, সম্ভবত ১৯৫৩ সালে। ৫৫ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর দেশে প্রকাশিত হয় হাড়কাটা গল্পটা। যখন দেশ-এ প্রথম গল্পটি ছাপা হচ্ছে তখন তিনি থার্ড ইয়ারের ছাত্র। আর যখন প্রথম বই প্রকাশ হচ্ছে, তখন তিনি ওই কলেজেই দশ বছর অধ্যাপনা করে ফেলেছেন। মাঝখানের এই পনেরো বছরে তিনি কিন্তু থেমে থাকেন নি। এর মধ্যে দুটো উপন্যাস বেরিয়ে গেছে। যযাতি, আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে, বেরিয়ে গেছে। মফস্বলি বৃত্তান্ত ধারাবাহিক প্রকাশ হচ্ছে। প্রচুর গল্পও লিখে ফেলেছেন। যথেষ্ট আলোচনাতেও আছেন, তাঁর নতুন ধরনের গদ্যরীতি নিয়ে, গল্প, উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে। এত লেখালেখির পরও, মাত্রই ৮ খানা গল্প নিয়ে প্রকাশ হল তাঁর প্রথম বই। দেবেশ রায়ের গল্প। বইয়ের নামটাও লক্ষ করার মতো।

এই যে পনেরো বছর ধরে একটা বইয়ের জন্য অপেক্ষা, কোথাও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। এই ধৈর্য্য। এই ধৈর্যের ছায়া তাঁর লেখায়ও পড়েছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তিনি শব্দ নিয়ে খেলছেন। বিন্যাসের প্রতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোণে আলো ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছেন। ধীরস্থির হয়ে একেকটা ছবি ফুটিয়ে তুলছেন। সিনেমার মতো গল্পগুলোকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পাঠক।

তিনি আরেকটা কথা, গল্পে গল্পে বলেছিলেন। বলেছিলেন, লেখার আগে তিনি শুধু ছবিগুলোই দেখতে পান না, চরিত্ররা কানের সামনে কোলাহল করে, কথা বলে। ঘুমোতে দেয় না। ঘুম থেকে উঠে তাদের লিখতে হয়। আমরা যারা সামান্য হলেও লিখি, আমাদেরও চোখের সামনে ছবি না এলে লিখতে পারি না। কিন্তু দেবেশ রায়কে চরিত্ররা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত কোলাহল করে।

বাংলা ছোট গল্পের আধুনিকতা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—"সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত গৌণ লেখকদেরই ইতিহাস, যারা দুই মহৎ লেখকের মাঝখানে স্থান ও কালগত শূন্যতা পূরণ করে মাত্র। কিন্তু বালজাক যেমন বলেছিলেন, 'প্রত্যেকটি প্রামাণিক যুগেরই অন্তত একটি উপন্যাস দরকার'—আমাদের সব চেষ্টাই সেই উপন্যাসটি লেখবার চেষ্টা। আর তাই আমাদের—বেঁচে থাকা। এই বর্তমান যুগের মর্ম বুঝতে, মার্কসবাদের বিজ্ঞান আমাদের দৈবনেত্রের উন্মীলন ঘটায়। আমাদের এই আধুনিকতার গূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়ে। আমার কাছে তাই মার্কসবাদ বিনা কোনো আধুনিকতা নেই।"

বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন তিনি। এক সময় কম্যুনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক ছিলেন। অথচ, তাঁর লেখা কখনোই রাজনৈতিক দলের লেখা নয়, তাঁর লেখা ছিল মানবিক রাজনৈতিক। মার্ক্সবাদী চেতনা তাঁর লেখায় অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এই চেতনার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষের জীবন, ভূপ্রকৃতি, তাদের বেঁচে থাকার নিজস্বতাকে।

উপন্যাসে পশ্চিমি অনুকরণের বদলে, আমাদের লোকায়ত ধারাকে অনুসরণের পক্ষে ছিলেন তিনি। বাংলা উপন্যাস নামের এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হওয়ার আগেই আমরা জানতাম উপন্যাস কী, উপন্যাস কী রকম হওয়া উচিত। আমাদের শুধু অপেক্ষা ছিল এমন একটি উপন্যাসের যা পড়লে ইংরেজি উপন্যাসের মতই লাগবে। আজও আমরা জানি উপন্যাস কী-রকম হওয়া উচিত। আজও আমাদের শুধু অপেক্ষা তেমন উপন্যাসেরই জন্য যা পড়তে হয়তো এখন মার্কিন দেশের উপন্যাসের মত লাগবে।"

"বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয় নি লোকায়ত পৌরুষ, বাংলা উপন্যাসের সংলাপে আসেনি আমাদের প্রতি ক্রোশে আলাদা

উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গশ্লেষরসিকতার শান। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলাই নাকী একমাত্র বা প্রধান নদী-বদ্বীপ যেখানে এত মানুষ বাস করে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না কত জল কত রঙের মাটি ভাঙে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলারও নাকী অন্যতম আকাশ যেখান থেকে বছরে এতগুলো মাস বৃষ্টি পড়ে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না কত রঙের মেঘ কত জল ঝরায়। আমাদের এই বাংলার ওপর দিয়েই বয়ে যায় রহস্যময় এক সামুদ্রিক বাতাস যার নাম মৌসুমি বায়ু। অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না—কোন খাত দিয়ে কী বাতাসে আমাদের গাছপালা দোলে। আর, এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনীর সেই মায়ামৃগ আত্মপরিচয় থেকে আমাদের আরো দূরে দূরে সরিয়ে এনেছে। বাংলা গল্প-উপন্যাসের আধুনিকতা তাই এখনো তাত্ত্বিক তর্কের বিষয়। শ্বাসেপ্রশ্বাসে, ঘামেরক্তে, প্রতিমূহূর্তের স্বকীয় বাঁচার কঠিন আনন্দে স্পন্দ্যমান সেই আধুনিক মানুষ আমাদের উপন্যাসে তার মহিমাময় বাঁচা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি যে তার দিকে তাকানো মাত্র সব তত্ত্ব অবান্তর হয়ে যাবে।”

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল, তিনিই গল্পের ছলে বলেছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁকে সংবর্ধনা দেবার প্রস্তুতি চলছিল। দেবেশ রায়কে বলা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে কিছু বলতে। তিনি বলেছিলেন, “আমি গুন্টার গ্রাসকে পড়েছি। কিন্তু তিনি তো আমার লেখা পড়েন নি, চেনেন না। তো আমি কেন যাব?”

তিনি দেশের ভেতরে ভেতরে একেকটা অজানা দেশকে খুঁজে বের করেছেন। তাঁর বাঘারু, চ্যাটকেটুরা যে জল-হাওয়ায় শালগাছের

মতো সাবলীল। যেখানে গয়ানাথ জোতদার অনায়াসে বলতে পারে "তু ভাসি যা বাঘারু।" সেই মাটি, সেই বৃষ্টি, সেই মৌসুমি বাতাস দিয়ে উপন্যাস গড়েছেন তিনি। তাঁর গল্প উপন্যাসে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানকে মেলাতে চেয়েছেন বারেবারে।

"এত জায়গার এত স্রোত তিস্তা দিয়ে যায় বলেই তিস্তাও যেন নিজেকে এমন ছড়িয়ে দেয়। এমন-কি এই সমতলে, যেখানে তিস্তা তিস্তাই, সেখানেও পশ্চিম পারে বোদাগঞ্জ-রংধামালি-জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি। আর পুব পারে মাল-লাটাগুড়ি-দোমহনি-ময়নাগুড়ি-বার্নেশঘাট-বাকালি-মেখলিগঞ্জ এই দুই পারের মাঝখানে তিস্তা মাইল-মাইল ছড়ানো-ছিটানো। যাকে তিস্তা বলা হয়, যে-জায়গাটিকে তিস্তা বলে সব সময় দেখা হয়, দেখানো হয় তার সবটা জুড়ে তো আর কখনো জল থাকে না। তিস্তা কোনো নদী নয়, এটা একটা ভূখণ্ড। শীতকালে এই ভূখণ্ডের মধ্যে পাথরের টিলা জেগে ওঠে, তাকে ঘিরে সুতোর মতো সরু কিন্তু স্থায়ী জলরেখা সোনা রঙের বালিকে সব সময় ভিজিয়ে রাখে, আর ভেজা বালিতে সেই টিলার জীবন্ত ছায়া সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এই ভূখণ্ডের কোনো অংশ জুড়ে নরম সবুজ কচি ঘাসের মাইল-মাইল বিস্তারে গরুমোষের বাথান ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রোমন্থন করে। এই ভূখণ্ডের কোনো অংশ জুড়ে নতুন কোনো অরণ্য জেগে ওঠে। কাশফুলের মাইল-মাইল বিস্তারকে দূর থেকে শরতের রোদে জল বলে বিভ্রম জাগে।"

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের এই অংশটা পড়ার পর মনে হয় আর কারোর তিস্তাকে এভাবে বর্ণনা করা ক্ষমতা নেই।

অলীক কল্পনা থেকে কোনো উপন্যাস উঠে আসে না। একদেশের পটভূমি, প্রেক্ষাপট থেকে অন্যদেশের আবহাওয়া আলাদা, মাটি আলাদা, জীবিকা আলাদা। একদেশের থেকে অন্য দেশের সঙ্কটও

ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির উপন্যাসের গঠন সেই দেশের বা অঞ্চলের আর্থিক সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের একজন চা শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে আফ্রিকার একজন কফি শ্রমিকের জীবনের গল্প কখনো এক হবে না। জীবন যখন আলাদা তখন উপন্যাসের শৈলি এক রেখে গল্পটা পালটে দেওয়া আরোপিত মনে হয়। অথচ প্রত্যেক অঞ্চলের, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর যে লোকসাহিত্যের ধারা, তা বজায় রেখে উপন্যাস শৈলি নির্মাণ করলে মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়।

ইউরোপীয় উপন্যাসের ছক ভেঙে বাংলা উপন্যাসে সাবালকত্ব আনার পক্ষে তিনি সাওয়াল করে গেছেন বরাবর।

এখনো এ দেশের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভেতরে ভেতরে প্রবাহিত হয় তাদের নিজস্ব গল্প, মিথ। সেই ধারাকে অনুসরণ করার কথা বলতেন তিনি।

আবার একেবারে নিজস্ব ঘরানায় অন্যধর্মী কিছু উপন্যাস সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ঢঙে তিনি লিখেছেন। সে প্রসঙ্গে আপাতত আসছি না।

অপরিকল্পিত তিস্তা ব্যারেজ নিয়ে তার ক্ষোভ বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, সরকারের সঙ্গে যুক্তি শানিয়ে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন। কোনো সরকারই এ নিয়ে সদর্থক ভূমিকা নেয় নি। তিনি আনন্দবাজারে লিখেছিলেন, “...গজোলডোবার ভাটিতে এই ৪০-৫০ কিলোমিটারই ভারতের তিস্তা। গজোলডোবার ব্যারাজে জল আটকালে এই পুরো ভারতের তিস্তাটাও জলহীন হয়ে পড়বে।”

যে কোনো জলপাইগুড়িবাসীর মতো শুকিয়ে যাওয়া তিস্তা তাঁকে পীড়া দিয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিস্তা ব্যারেজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দেবেশ রায়। প্রত্যাখ্যান করেছে জলপাইগুড়িবাসী, প্রত্যাখ্যান করেছে আপেলচাঁদ ফরেস্ট। আর এই সব প্রত্যাখ্যানের

মুখ হয়ে উঠেছে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের বাঘারু।

"বাঘারু তিস্তাপার ও আপেলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারণে তিস্তাপার ও আপেলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে—সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপেলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপখোপ চলে যাবে—সে-কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সে শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই, বাঘারুর কোনো উৎপাদন নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতিকে, এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।"

আমার দেবেশ রায়

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের প্রখর মেধাদীপ্ত লেখক দেবেশ রায়ের সঙ্গে নিতান্ত মেধাহীন আমার সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত চালিত হল অভিমানে। আমার নিজের বিবেচনায়, দু'তরফ থেকেই।

দেবেশ রায়কে আমি প্রথম দেখি ১৯৮০ সালের কোনও এক সময়ে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ইসকাসের ৫ নম্বর ঘরে। আসানসোল–দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের 'পরিচয়'–এর গ্রাহক–পাঠক–শুভানুধ্যায়ীদের এক সভায়। বছর দেড়েক আগে প্রয়াত হয়েছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেশ রায় পরিচয়ের নতুন সম্পাদক। গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের জন্য এক অনবদ্য সম্পাদকীয় আবেদন তিনি লিখেছেন পরিচয়ের পাতায়। সে উদ্দেশ্যেই তাঁর আসানসোলে আসা। দেবেশদা নিজের কথা বলতে শুরু করার পর আমি চমকে উঠলাম। এমন শাণিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা এর আগে যে শুনিনি। অশোক মিত্র আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা তার অনেক পরে হয়েছে। সেদিন দেবেশদার বলা কথা আর শিল্পাঞ্চলের প্রতিনিধিদের তুলে ধরা সমস্যার কোনও সমাধান গত ৪০ বছরে হয়নি। সে এক অভিমান।

পরিচয়ের দীপেন্দ্রনাথ সংখ্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,

দু'খণ্ডে দীপেন্দ্রনাথের রচনা বেরোবে। দেবেশদার সম্পাদনায়। তার গ্রাহক সংগ্রহ করা হয়েছিল গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে। প্রথম খণ্ডের পর আর বেরোয়নি। সেই গ্রাহক সংগ্রহে আমাদের পারিবারিক কিছু ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে আমার বাবার। কলকাতা বইমেলায় পরিচয়ের স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দেবেশ রায়কে আমি সেই প্রশ্ন করেছিলাম। দেবেশদার জবাব ছিল, 'এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। মন ছোট হয়ে যাবে।' সেই উত্তরের তাৎপর্য আমার কাছে কখনও স্পষ্ট হয়নি।

বাবার মৃত্যুর পর আসানসোল ছেড়ে আমি চলে আসি শহর কলকাতায়। পরের ৫ বছর যতবার আসানসোলে গেছি, ওই রচনা সংগ্রহের গ্রাহকরা আমাকে বার বার প্রশ্ন করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে। আমার কোনও জবাব ছিল না। এক কথায়, সেই পিতৃঋণ শোধ করার তাগিদেই আমি দীপেন্দ্রনাথের গল্প–উপন্যাস–রিপোর্তাজ সংকলনের কাজে হাত দিই। আনকোরা, অনভিজ্ঞ আমার হাতে প্রথম যে সংকলনটি তৈরি হয়, তার অব্যবহিতে লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পাশে বসিয়ে দেবেশদা আমাদের পারিবারিক কমিউনিস্ট উত্তরাধিকারের সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন। তাতেও দীপেন্দ্রনাথ নিয়ে দেবেশদার ভূমিকা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।

গল্প, উপন্যাস যথাসম্ভব সংগ্রহ করে সংকলন করার পর আমি দীপেন্দ্রনাথের রিপোর্তাজগুলো খোঁজাখুঁজির কাজ শুরু করি। সে সময়ে এক সকালে দেবেশদাকে আমি ফোন করেছিলাম। যদি ওঁর সংগ্রহে একটা–দুটো বিরল লেখা থাকে, সেটা পাওয়ার জন্য। দেবেশদা বললেন, 'আমার কাছে কিছুই তো নেই। থাকার কথাও তো নয়।' আমার পরবর্তী প্রশ্ন, 'তা কেন? দ্বিতীয় খণ্ডে আপনি কিছু তো ছাপতেন? সেই টেক্সটও আপনার কাছে নেই?' দেবেশদা বললেন,

‘বললাম তো নেই।’ আমার আবার প্রশ্ন, দেবেশদার ধৈর্য্যের বিবেচনা না করে, ‘লোকে তো বলে, আপনার কাছে সব আছে। তাহলে?’ এইবার দেবেশদার জবাব, ‘জনশ্রুতি আর বাস্তবতার তফাৎ না বুঝে দীপেন্দ্রনাথ করা অসম্ভব। আমার আর কিছু বলার নেই।’

শেষ পর্যন্ত একটা–দুটো গল্প আর ক্ষীরোদ নট্টকে নিয়ে রবিবারের কালান্তর–এ প্রকাশিত দীপেন্দ্রনাথের অনবদ্য রিপোর্টাজিটা ছাড়া আমি মোটের ওপর দীপেন্দ্রনাথ করেছি। দেবেশদা এটা জানতেন। বছর আটেক আগে আমার এক বন্ধু এক সাময়িক পত্রের ‘দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা’–র জন্য আমার কাছে লেখা চায়। আমি দিতে সম্মত হইনি। সে এক গূঢ় কারণে। এমনই আমার জীবন যে, সেই সংখ্যা কোনও এক দৈনিক পত্রে আমাকেই রিভিউ করতে দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, পরিচয়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়—জীবনের প্রথম পাঁচ দশকের অনেক অমীমাংসা, স্বপ্ন, হাহাকার মিলেমিশে সে এক অচেনা রসায়নে আমি সেই রিভিউ লিখেছিলাম। নিজের মধ্যে কিছু প্ররোচনা অবশ্যই ছিল। রিভিউ বেরনোর বছর দুয়েক পরে দেবেশদার সঙ্গে সাহিত্য আকাদেমির এক অনুষ্ঠানে দেখা। অনুষ্ঠান শেষে ডি এল খান রোডে সাহিত্য আকাদেমির দোতলার বারান্দায় দেবেশদা আমাকে সামনে পেয়ে বললেন, ‘ওই শব্দটা কী করে লিখলেন?’ এমন প্রখর সংবেদন ও স্মৃতি ধারণ করতেন বলেই তিনি দেবেশ রায়। বাংলা সাহিত্যে গত ছয় দশকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। নিজের শব্দ ব্যবহারের প্ররোচনা সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম বলেই জবাবে মাথা নিচু করে ছিলাম। সংলাপ শেষ হওয়ার পর দেবেশদা আমার পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে নিচে নেমে যান। অনেকক্ষণ আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

আসলে দু’দশক কেটে যাওয়ার পরও দেবেশদা যখন দীপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনায় উদ্যোগ নিলেন না, তখন

আমি কোথাও কোথাও ওই উদ্যোগ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, দেবেশদা পার্টিকে বলেছেন, দীপেনের লেখাপত্র মহাকালের ব্যাপার। এখনই ও নিয়ে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। তারও ২০ বছর পর আমি ওই 'মহাকাল' শব্দটাই ব্যবহার করি 'দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা'-র রিভিউ করতে গিয়ে।

দেবেশদা পরিচয় সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার পর ওই সাময়িক পত্রের আজীবন গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হয়েছিল। আসানসোলের অনেকে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। সেই আজীবন গ্রাহকদের পত্রিকা দিতে পরে অস্বীকার করে পরিচয় কর্তৃপক্ষ। কোনও এক আসানসোল সফরে সে কথা জানার পর আমি নিজের মতো করে পরিচয়ের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করি। এতে অবশ্য দেবেশদার কোনও ভূমিকা নেই। এমনই তো আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পরিচালিত সংগঠনগুলোর দূরদৃষ্টি ও কর্মপদ্ধতি। যে কারণেই খোদ কালান্তর দপ্তরে কালান্তরের পুরনো সংখ্যা আদৌ পাওয়া যায় না।

এ সব আসলে আমাদের প্রজন্মের গভীর যন্ত্রণার কথা। ঝাঁপি খুললে শেষ হতে চায় না। তাই থেমে যাওয়াই ভাল। দেবেশ-দীপেনের বন্ধুত্ব একটা মিথ-এর চেহারা নিয়েছে কোনও কোনও মহলে। আমার কাছে তা আদৌ কোনও মিথ নয়। আসলে যে কী, তা আমি নিজেও জানি না। যে বন্ধুত্ব নিয়ে দেবেশদার এত দাবি, সেই বন্ধুত্বে তাঁর ভূমিকা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে রহস্যময়। সে রহস্য ভেদ করতেও আমার কোনও আগ্রহ নেই। যদিও ভেদসূত্র আমি মাঝেমধ্যে মানসচক্ষে দেখতে পাই।

প্রতিক্ষণ আমাকে জীবনে প্রথম চাকরি দিল। অবশ্যই দেবেশ রায়ের কৌলিন্যে। কাজ করছি। আমাকে পাঠালেন পাড়ারিয়া গণধর্ষণ মামলার পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য। সেখানে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা হল, সে কথা কোনওদিনই কাউকে বলতে

পারব না। নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখে সেই অভিজ্ঞতার কথা অবশ্য আমি কোথাও আমার কোনও লেখায় লিখেছি। ফিরে আসার পর পাটনা হাইকোর্টের রায়ের যে কপি আমি দেওঘর থেকে ট্রেন আসতে আসতে পড়েছিলাম, সেটা ব্যাগে নিয়ে আসানসোল থেকে গেলাম প্রতিক্ষণ দপ্তরে। কপি আমি জমা দিয়ে দিয়েছিলাম। বন্ধু আফসার আহমেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওই রায়ের জেরক্স কপিটার কথা উঠে এসেছিল। আফসারের কাছে দেবেশ রায় এক দেবতা। ও কথাটা দেবেশদাকে গিয়ে নিশ্চিতভাবে বলেছিল। প্রতিক্ষণ দপ্তরের যে ঘরে দেবেশদা বসতেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন। ‘কী ব্যাপার? পাটনা হাইকোর্টের রায়ের কপিটা কেন দেননি আমাকে?’ মাথা নিচু করে আমি বললাম, ‘ওটা তো আমার।’ দেবেশদার জবাব ছিল, ‘কী করে আপনার হয়? প্রতিক্ষণ আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে। আপনি গিয়েছেন। ওটা আমাকে এক্ষুণি দিন।’ আমি ব্যাগ থেকে বের করে দেবেশদাকে ওই পাড়ারিয়া গণধর্ষণ মামলায় পাটনা হাইকোর্টের রায়ের কপিটা দিয়ে দিলাম। সে বছর শারদীয় সংখ্যায় দেবেশ রায়ের উপন্যাসের শিরোনাম ছিল

‘ধর্ষণের পরের সকালে এরকম ঘটে থাকে’। সেই শারদীয় সংখ্যা হাতে নিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। গোটাটাই ওই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা।

এখন লিখতে খুব খারাপ লাগছে যে, এই সমস্ত লেখাগুলো জুড়ে দেবেশদার যে ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’, তা কিন্তু পাঠককে কোথাও টানেনি। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও সুমন মুখোপাধ্যায়ের নাটকে যেভাবে দর্শক টেনেছিল, ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ কিন্তু একদম চলেনি। দেবেশদা কি কোথাও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন? এই কথা তো দেবেশদাকে বলতেই পারব না। দেবেশদার মৃত্যুর পরে বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান

লেখক আমার কাছে দেবেশদার সাহিত্যিক জীবনের পরম্পরা জানতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আমি ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলাম। তিনি তাঁর মতো করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। সেই সিদ্ধান্ত জীবনের থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

তখন প্রতিক্ষণ থেকে 'জীবনানন্দ সমগ্র' বেরতে শুরু করেছে। কোনও এক মামলার কারণে গোটাটাই ন্যাশনাল লাইব্রেরির আর্কাইভে রাখা আছে। সেই মামলার রায়ের সূত্রেই দেবেশ রায় জীবনানন্দ দাশের লেখাপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রকাশক, প্রতিক্ষণ। প্রথম দিকে জীবনানন্দের অপ্রকাশিত গদ্যের জন্য যে আমি আসানসোল থেকে তুমুল অপেক্ষায় দৌড়ে আসতাম কলকাতায়, একদিন সেই দেবেশদা আমাকে দায়িত্ব দিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জীবনানন্দের উপন্যাস কপি করার। সে এক অভিজ্ঞতা বটে আমার। একটা কম্পিউটারের সামনে আফসার আহমেদ, পাশেরটায় আমি। সারা দিন জীবনানন্দ দাশের পেনসিলে লেখা উপন্যাসের পাঠোদ্ধার করা—কী কঠিন! কী অসম্ভব! একদিন গোটা সকাল কেটে গেল জীবনানন্দের একটা শব্দের পাঠোদ্ধার করতে। বিকেলে আবিষ্কার করলাম, ওটা ছিল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'। জীবনানন্দ লিখেছিলেন ভি এম। এরকম আরও অনেক। তা নিয়ে আমার আলাদা লেখা আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ওই ঠান্ডা ঘরটায় ভোরের ট্রেন ধরে আসানসোল থেকে এসে জীবনানন্দ কপি করা আমার এক মাসের বেশি সয়নি। ভয়ানক সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়ে আমি দেবেশদাকে বললাম, 'দেবেশদা, এত ঠান্ডায় আমি অভ্যস্ত নই।'

দেবেশদা আমার কথা শুনেছিলেন। আফসার কাজটা চালিয়ে গিয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত গল্প, উপন্যাস নিয়ে এখন অনেকে অনেক রকম দাবি করেন। আমি ব্যক্তিগত রুচিবোধ

থেকে তাদের কারও বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এই কথাটা তো বলতেই হবে যে, জীবনানন্দের অপ্রকাশিত সমস্ত লেখার যে অসামান্য সম্পাদনা দেবেশদা করেছিলেন, একেকটা গল্পের কী যে অনবদ্য, অবধারিত শিরোনাম দিয়েছিলেন, তার কোনও তুলনা আমি আজ অবধি জীবনানন্দর গবেষকদের কারও মধ্যে খুঁজে পাইনি। জীবনানন্দের একটা কবিতা সংকলনও দেবেশদা করেছিলেন। 'হে প্রেম, তোমাকে ভেবে ভেবে' এই সব কবিতা জীবনানন্দের অস্বাক্ষরিত। সেগুলোর নামকরণ দেবেশদাই করেছিলেন। সে যে কী অমোঘ, তা আমি কাউকে বলতেই পারব না।

(২)

দেবেশ রায়ের গল্প, উপন্যাস পড়তে শুরু করার আগেই আমার কাছে কালান্তরের পাতায় দেবেশদার নিয়মিত কলমের অপেক্ষা তীব্রতর ছিল। তখন বাণিজ্যিক কোনও দৈনিকে দেবেশদা লেখা শুরু করেননি। সপ্তাহে একদিন কালান্তরে লিখতেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে নোটের আকারে। তার পর আজকাল, শেষে আনন্দবাজারেও। সেই অর্থে গত সাড়ে তিন দশক রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে দেবেশ রায় আমার কাছে ছিলেন অপরিহার্য। রীতিমতো অপেক্ষায় থাকতাম। মনে আছে, নন্দীগ্রামে যেদিন গুলি চলল সেদিন রাতে আমার কাগজের দপ্তরে অপেক্ষা করে আছি দেবেশদার লেখার জন্য। হাতের লেখাটা আমার ভীষণ চেনা। প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি যতিচিহ্নে। লেখা এল। 'ওরা চেয়েছিল কয়েকটা লাশ, ওরা পেয়ে গেল'। আমি রিডআউট করছি, সহকর্মীদের কেউ কম্পোজ করছে। প্রতিটি ছত্রে দেবেশদার সঙ্গে আমার দ্বিমত। তবু লেখাটাকে অস্বীকার করতে পারছি না। তারও পরে দেবেশদার রাজনৈতিক অবস্থান বদলেছে। সে বদলকে যে খুব মেনে নিতে পেরেছি, এমনটা

নয়। আবার অবচেতনে সম্পূর্ণ খারিজও করতে পারিনি। পরিচয়, প্রতিক্ষণ, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট আর সবশেষে সেতুবন্ধন। বাংলা সাহিত্যে সম্পাদনার এক দৃষ্টান্ত তৈরি করে গেছেন দেবেশদা। কোনওটা মেধার দীপ্তিতে, কোনওটা জনপ্রিয়তার নিরিখে। কিন্তু কোনওটাই জনরুচিকে তোয়াজ করে নয়। বরং শাসন করে। আমি দেবেশদার সেই কলম, সেই সম্পাদনা প্রতি মুহূর্তে মিস করি।

আর ৬ মাসের মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও জটিল এক নির্বাচন হতে চলেছে। চারপাশের ঘটনাক্রম ও উচ্চারণে কখনও কখনও নিজেকে দিশেহারা, বিভ্রান্ত এক অস্তিত্ব মনে হয়। এই সময়ে আমি দেবেশ রায়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, পর্যবেক্ষণ, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত অবস্থানকে ভীষণভাবে মিস করছি। এই শূন্যতা আমার জীবনে আমার বাবার মৃত্যুর পর কখনও কোনওভাবে আসেনি। এই শূন্যতা আমি পার হয়ে যেতে পারব তো? ব্যক্তিগত অস্তিত্বের নিরিখে? আমি সন্দিহান।

পারিবারিক বৃত্তান্ত

গৌতম সেনগুপ্ত

বেঁচে থাকলে এই লেখার শিরোনাম হতেই পারত আন-অফিসিয়াল দেবেশ। তা নিয়ে তক্কোও কিছু কম হত না। তবে এমন নাম বেশ পছন্দ ছিল তাঁর। একবার বলেছিলেন, "এই সরষের তেলের গন্ধ বাংলা সাহিত্যকে শেষ করে দিল।" তাঁর ঘরে তখন তলস্তয় দস্তয়েভস্কির ছবি। মানে-র গল্পসমগ্রের সূচিতে লেখকের বয়স লিখে রাখছেন পেনসিলে, স্টোরিজ অফ টু ডিকেডস্‌এর ঢঙে, প্রকাশিত হচ্ছে দুই দশক।

মজাটা এখানেই। যে সরষের তেলের কথা উঠল, সেই সরষের তেল বা দেশজ আখ্যানের (শব্দবন্ধটি দেবেশেরই তৈরি) জন্যই আক্ষরিক অর্থে লড়ে গেছেন দেবেশ, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে। বাংলা গল্প-উপন্যাসে পাঁচের দশকের সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান সত্যিই বেয়াড়া বিস্ময় চিহ্নের মতো। তিনি কার উত্তরসূরী? তারাশঙ্কর? সতীনাথ? বলা মুশকিল। গুণিজনদের লেখা থেকে হয়তো কিছুটা হলেও ধারণা করা যাবে। আপাতত চেষ্টা করা যাক পারিবারিক গণ্ডিতে দেবেশকে ধরার।

দু-দশক খুব কাছ থেকে দেখার ফলে বেশ জোর দিয়েই বলা যায় এই পরিবারটিও তাঁর লেখাপত্রের মতোই অন্য ও দেবেশের

একক নির্মাণ। উৎসাহী কেউ চাইলে ‘তৃপাকে’ একতোড়া নামক রচনাগ্রন্থের প্রথম চারটি লেখা দেখে নিতে পারেন। এখানে মায়ের শ্রাদ্ধের কার্ডে উদ্ধৃত হন দান্তে, পুত্রকে বই উৎসর্গের সময় এসে পড়ে ইউরিপেডিসের সংলাপ। এখানে বয়স কোনো ব্যাপার নয়। তাই এদৃশ্য মোটেই বিরল নয় যে ৭ বছরের কেউ মন দিয়ে পরামর্শ দিচ্ছে বছর ৬০-এর কাউকে। যে দিচ্ছে এবং যিনি নিচ্ছেন দুজনেই সমান সিরিয়াস। মতে না মিললে ঝগড়া অবধিও যাচ্ছে, কিন্তু সবই ঘটছে প্রবল গাম্ভীর্যের মধ্যে। কৌতুকের লেশমাত্র সেখানে নেই।

পারিবারিক বিয়ের ভিডিও-এ কাকা ভাইঝির তুমুল তর্ক হচ্ছে হিন্দুদের শোকের চিহ্ন সাদা না কালো তাই নিয়ে। এক সময় ওই বাড়ির খাওয়ার টেবিলের আলাপ-আলোচনাগুলো লিখে রাখতেন শ্রী তীর্ণা রায়। ঘনিষ্ঠ এক তরুণের সৌজন্যে পড়ার সুযোগ হয়েছিল, টুকেও রেখেছিলাম। খাতাটা হারিয়েছে। না হলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করা যেত। এরপরও কেউ বলতে পারেন এসবের টুকরো-টাকরা তো পাওয়াই যায় দেবেশের নানান লেখায়। কিন্তু যে কথাটা তুলতে চাইছি আমি, তা কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনায় আবদ্ধ নয়। তা রয়েছে ঘটনার পেছনের দর্শনে। আমার ধারণা দেবেশের লেখার, লিখনভঙ্গির যে ম্যাজিক, তার দর্শনের প্রধান সূত্রটা লুকিয়ে আছে এইখানে। এই পরিবারের ভেতরে ঘটা আপাত-তুচ্ছ ঘটনায়, আর আপাত-তুচ্ছ সমাধানে। একটা হালকা গল্প দিয়ে শেষ করা যাক। তার আগে দেবেশের পারিবারিক গণ্ডির লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক।

শ্রী পুষ্পেন ভৌমিক দেবেশের পুরোনো বন্ধু, ভগ্নিপতিও। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার সময় ওই অঞ্চলের বেশ অনেকটা ঘুরিয়ে দেখান দেবেশকে। শ্রী অঞ্জলি রায় দেবেশের দাদা প্রয়াত সাহিত্যিক দিনেশচন্দ্র রায়ের স্ত্রী। দেবেশের জবানে, ‘পি সি সরকার যেমন

চিরকালই জুনিয়ার, আমিও তেমন অলটাইম ভাইসক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন বলাই বাহুল্য শ্রী অঞ্জলি রায়! কাকলি রায় বিশিষ্ট গায়িকা ও গান্ধার গোষ্ঠীর কর্ণধার একসময়ের চ্যাম্পিয়ান ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার ও দেবেশের সহধর্মিণী। শ্রী তীর্ণা রায় লেখক, অনুবাদক, সাংবাদিক, সম্পাদক। বাংলায় লেখার ব্যাপারে ঈষৎ আলস্য থাকলেও ইংরেজি ও জাপানিতে অত্যন্ত সাবলীল। দিনেশচন্দ্র ও অঞ্জলির কনিষ্ঠ কন্যাকে দেবেশ ডাকেন কেলে বলে।

এবার গল্পটা। আমার ঘনিষ্ঠ সেই তরুণ তখন রায়বাড়িতেই থাকে, কলেজ ছেড়ে শুরু করেছে অফিস যেতে। সন্ধ্যায়, ছাদের নিভৃত আড্ডায়, তাঁর বস-এর অবুঝপানা, দেবেশের ইডিওসিনক্রেসি থেকে তাঁর ও তাঁর দিদির সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থী, সব নিয়েই দেদার রসিকতা চলে আমাদের। তারপর গত শতকের শেষদিকে বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে দূর শহরতলিতে যেতে হল তাঁকে। দূর, তাই থাকতে হল রাতে। পরদিন ভোরে নিতান্তই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বন্ধুর পড়শির বাড়ি। সেখানে এক কিশোরীর সঙ্গে চোখাচোখি, সামান্য কথা। না, না, যা ভাবছেন তা নয়, সে জোর দিয়ে জানায়। শুধু এরপর থেকে শুধু বাকি কথাগুলোই বলছে তারা। না, বেশিক্ষণ নয়। রাত ১টা থেকে ৪/৪-৩০ অব্দি, রোজ। এমনি কিছু নয়, প্রবলেম শুধু সকালে অফিস যাওয়াটা। অন্য ব্যবস্থাও তো করা যায়। জবাবে সে শিউরে ওঠে, “ওরে বাবা, দেবেশ রায়।” আমি তাজ্জব। “কেন মানবেন না?” সে ফ্যাকাশে মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, “ওফ্ সে আপনি ভাবতেও পারবেন না।”

এর মাস কয়েক পর বিয়ে হয় তাদের। দেবেশের নির্দেশ মেনে তৈরি হয় কার্ড। শ্রী যুধাজিৎ সেনগুপ্তের অসাধারণ অঙ্কনসমৃদ্ধ সেই কার্ডটি ছিল দেড়ফুট বাই একফুট। এই বিয়ে সংক্রান্ত সিরিজ অফ মিটিঙের একটিতে থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার। যেখানে শহরের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্যাটারার বিজলি গ্রিলের পোড় খাওয়া ম্যানেজারকে স্তম্ভিত করে ৭ রকম পোলাওয়ের দাবি তুলেছিলেন দেবেশ। ভোটে নাকচ হয় তাঁর মত। হয় তিন রকম পোলাও। মোট পদ ছিল ২৬ বা ৩০ টি। পাত্রীকে আশীর্বাদ করার জন্য অ্যানেকডোটে কমবেশি পারিবারিক ইতিহাসের একটি বই লেখেন দেবেশ।

বউভাতের ভরা আসর থেকে বেরোনোর মুখে সেই তরুণটি শুধু ম্লান হেসে বলেছিল, "বলেছিলাম না, ভাবতেও পারবেন না।" প্রিয় পাঠক, এই 'বাহুল্য'ই কি দেবেশের সুবিখ্যাত লিখনশৈলীর অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য নয়?

দেবেশ রায়: উপন্যাসের ভাষা ও ভাষাচিন্তা

স্বরূপ কুমার সরকার

লোকশ্রুতি বা অতিকথা, ইংরেজিতে যাকে বলে মিথ, সেই লোকশ্রুতি, নতুন করে তৈরি করে তুলতে গেলে, পুরোনোকে তো ভাঙতেও হয়। দেবেশ রায়ের ক্ষেত্রে এটা বারবার ঘটেছে, তিনি জীবিতাবস্থায়ই মিথে পরিণত হয়েছিলেন; আর সেই লোকশ্রুতি তৈরি হয়ে উঠছিল তাঁর লেখালেখি শুরুর আদিপর্ব থেকেই। গত শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে যে লোকশ্রুতির সূচনা তা ক্রমেই গাঢ়তর হয়েছে, এবং, তাঁর জীবিত থাকার শেষদিন পর্যন্ত তা পুষ্ট হয়ে এসেছে। সেই ছয়ের দশকেই বাংলা গল্পের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বৃহত্তর অর্থে বাংলা গদ্য সাহিত্যেই যে বৈপ্লবিক ভাঙচুর ও নতুন গঠন তৈরি হয়ে উঠেছিল, তার প্রধান ছিলেন দেবেশ রায়। আটের দশকে সেই গদ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো; বজ্রপাতের শব্দের কান বধির করে দেওয়ার মতো। যদিও, বাজ পড়ার মতো আকস্মিক ছিল না ঘটনাটা। এর পেছনে ছিল তিন তিনটি দশক জুড়ে অপরিমেয় শ্রম ও মননচর্চা। এই একই ব্যক্তির প্রভাব তারপর থেকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই অনুভূত হয়েছে। বাংলা উপন্যাস ও গল্পে ততদিনে এসে গেছেন তাঁর দ্বারা প্রভাবিত লেখক পাঠক সম্প্রদায়। মূলত সেই আটের দশকের লেখকেরাই এখন বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখক।

বহু বহু লেখক পাঠক সমালোচক তাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই প্রভাবিত হলেও দেবেশ রায় সম্পর্কে লেখাপত্রের সংখ্যা খুবই কম। বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটকে পেছনে দাঁড় করিয়ে রাখলেও যাঁর সৃষ্টিকর্ম, অভাবনীয় বলে চিনে নেওয়া যায়, যাঁর নামের সঙ্গে তুলনায় উচ্চারিত হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিকদের নাম; তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি ও আলোচনার এত স্বল্পতা, এই বিস্ময় থেকেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে তৈরি হয়ে ওঠা মিথের বিষয়ে ফিরব।

দেবেশ রায়-কে বলা হত লেখকদের লেখক। শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই এইরকম অভিধা কোনো লেখককে দেওয়ার উদাহরণ প্রায় নেই, বা একেবারেই নেই। লেখকদের লেখক বলতে তো এটাই বোঝানো হয় যে এই লেখকের লেখা সাধারণ পাঠকদের জন্য নয়, প্রধানত লেখকরাই এই লেখকের লেখা পড়তে পারবেন ও বুঝতে পারবেন। এই বক্তব্য অর্ধসত্য নিশ্চিতভাবেই। কারণ দেবেশ রায়ের পাঠককুল বিপুল ও সারা পৃথিবীতেই বিস্তৃত। তা সত্ত্বেও এই বক্তব্যের অর্ধেক সত্যটা হল, দেবেশ রায়ের লেখা সবার জন্য নয়; প্রকৃত সাহিত্য পাঠক, বা বলা যায় ধুরন্ধর সাহিত্য পাঠক ছাড়া দেবেশ রায়ের লেখার মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়। তা হলে কি দেবেশ রায়ের লেখা দুর্বোধ্য? তাই বা কী করে বলা যাবে। তিনি তো বাংলা ভাষাতেই লেখেন আর অপরিচিত শব্দ বা বাক্যবন্ধ পারতপক্ষে ব্যবহারই করেন না। এ কথা অবশ্য সত্যি যে তিনি বাংলা ভাষায়, মানে চলিত এখনকার বাংলা ভাষাতেই লেখেন এবং অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্যবন্ধ প্রায় ব্যবহারই করেন না, তবে, তাঁর বাক্যগঠন ও ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত আধুনিক। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন নতুন এক উপন্যাসের ভাষা। বস্তুত আধুনিক উপন্যাসের নির্মিত ভাষার জনকই তিনি। এই নতুন আধুনিক ভাষায় রপ্ত হতে না

পেরে মুষ্টিমেয় কিছু লেখক পাঠক সমালোচক তাঁর লেখায় প্রবেশ করতে পারেন না এবং দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনেন।

কিন্তু যাঁরা দেবেশ রায়ের লেখা পড়েন এবং বোঝেন, তাঁদের কাছেও কেন লেখক দেবেশ রায় মিথে পরিণত হয়ে যান? এরও উত্তর আছে দেবেশ রায়ের লেখার ভাষায়। যে ভাষা বিষয়ের চাপে ও লেখক ব্যক্তিত্বের তাপে হয়ে উঠেছে ভাস্কর্যের মতো ত্রিমাত্রিক, সময়ের মতো গতিশীল এবং সর্বনির্মাণক্ষম। যে ভাষায় তিনি সমসাময়িক সমাজ, জীবন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি নিয়েই লেখেন; কোনো ব্যাবসায়িক প্রয়োজন বা জনপ্রিয়তার চোরাবালির টানে অনতি অতীত কাল বা ঐতিহাসিক কাল নিয়ে লেখেন না; শুধুমাত্র দুটি নরনারী উপস্থাপিত করে বাস্তব সম্পর্ক শূন্য, বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষ কাহিনি লেখেন না; তাকে বাস্তবতার শেষ ধাপ পর্যন্ত যাচাই করে তবে বিষয়ের স্থান দেন। বাংলা গল্প উপন্যাসে যেটা প্রায় কখনোই আসে না, সাধারণ বাংলা গল্প উপন্যাসে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা দেবেশ রায়ের লেখায় সেভাবেই আসে যেভাবে তা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের গোপন নিভৃত ভাবনাচিন্তার মধ্যেও কোথায় রাষ্ট্রশক্তির অনুপ্রবেশ আমাদের চালিত করছে সেটা গল্প উপন্যাসের ভাষায় নিয়ে আসা কোনো সাধারণ কাজ নয়; সবকিছুকেই অতিক্রম করতে পারা প্রতিভার কাজ। সে কাজ সম্পন্ন হয়ে এসেছে দেবেশ রায়ের লেখায় গত ষাট বছর ধরে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ভাষাচর্চা ও বিষয়চর্চা নিয়ে আগামী দশকগুলো জুড়ে কাজকর্ম গবেষণা চলতেই থাকবে।

(২)

উপন্যাসের ভাষাকে হতে হয় সর্বত্রগামী, কারণ মানবজীবনের চিন্তার বিমূর্ততা থেকে পথচলতি কোনো ব্যক্তির অস্ফুট কোনো

চলিত শব্দ বা বাক্যের স্বগতোক্তি সবটাই উপন্যাসের অঙ্গীভূত বিষয়। চিন্তার কাব্যময়তা বা যাপনের নাটকীয়তা বা তথ্য তর্ক যুক্তি তত্ত্বের বিনিমিয়, সবটাই উপন্যাসের অভ্যন্তরে ঘটতে পারে। জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকার তাগিদে বা জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখার চেষ্টায় উপন্যাসই সবচেয়ে বেশি জীবনসম্পৃক্ত শিল্প।

গল্প বা কাহিনিকে প্রলম্বিত করলেই তো আর উপন্যাস হয় না। যদিও বর্তমান বাংলা ভাষা চর্চার পত্রপত্রিকাতে, সে বাণিজ্যিকই হোক বা অবাণিজ্যিক, পনেরো হাজার, কুড়ি হাজার, তিরিশ হাজার শব্দে উপন্যাসের আয়তন নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে কটা প্রকৃত উপন্যাস সেই সন্দেহকে নির্মূল না করেই। শিল্পচর্চা, বিশেষত ভাষা নির্ভর শিল্পচর্চা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা নয় যে তাতে শব্দ সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলেই পরীক্ষকদের ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে। আর, শুধু তো শব্দসংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা দিয়েই উপন্যাসকে মাপা যায় না। গত চারশোর বেশি বছর ধরেই সর্বজনস্বীকৃত বিশ্ব উপন্যাসের ইতিহাস উপন্যাসের একটি মূল সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এসেছে; আধুনিক উপন্যাসের অপূর্বতম বিস্তৃত ভুবনে সেই সংজ্ঞাকে স্বীয় মূল স্বীকার্য করেই সীমা অতিক্রমী ও আপাত অসংগতিপূর্ণ স্ববিরোধী বিন্যাসও উপন্যাসের সংজ্ঞাকে ক্রমাগত প্রসারিত করে গেছে। দীর্ঘ কাহিনিই উপন্যাস নয়, বহুল বা অসংখ্য ঘটনা পরম্পরা গ্রথিত করলেই উপন্যাস হয় না, লেখকের নেহাত ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ উপস্থাপনই উপন্যাস নয়, শুধুমাত্র কাল্পনিক ব্যক্তি বা সমষ্টির পারস্পরিক আদানপ্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নতুন ভূখণ্ডের ভ্রমণকাহিনি সুলভ উপস্থাপন—উপন্যাস নয়। আবার, এমনকি কোনো ব্যক্তির আত্মজীবনীও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে, যেমন পারে কোনো গোয়েন্দা কাহিনিও; খবরের কাগজে ছাপা অসংখ্য আপাত বিচ্ছিন্ন

ঘটনার সমাহারও হয়ে উঠতে পারে উপন্যাস, কোনো আদালতে চলা মামলার নথি বা কোনো হাসপাতালের কোনো চিকিৎসার বিবরণও হয়ে উঠতে পারে উপন্যাস—যদি গত চারশোরও বেশি বছর ধরে তৈরি হয়ে ওঠা, উপন্যাসের নিজের ভেতর থেকেই তৈরি হয়ে ওঠা, সংজ্ঞাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

মানবের আত্মবিকাশের বিবরণই উপন্যাস।

এখানে বিবরণ শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত আরও একটি নির্দেশ—উপন্যাসের ভাষাকে হতে হবে উপন্যাসেরই ভাষা। উপন্যাসের ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট অর্থকে, সেই নির্দিষ্ট অর্থটি তৈরি হয়ে ওঠে সেই নির্দিষ্ট শব্দটি যে বাক্যের অন্তর্গত সেই বাক্য গঠনের যুক্তিতে। আর, সেই নির্দিষ্ট বাক্যটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝায় বাক্যটি যে প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত সেই প্যারাটির যুক্তিক্রম অনুসারে। আবার ওই প্যারাটিও তার আগের ও পরের প্যারাগ্রাফের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে ন্যায়ের অন্তর্লীন এক সংযোগে। সে কারণেই উপন্যাসকে খণ্ডিত করা যায় না বা খণ্ডিত করে নিলে উপন্যাসে সেই অংশের উদ্দিষ্ট অর্থ সবসময় বোঝা যায় না। উপন্যাস একটাই সমগ্র শিল্পকর্ম। গল্প বা কবিতা বা নাটকের শব্দ-বাক্যের বহুস্তরীয় অর্থ উপন্যাসের শব্দ-বাক্যে খুঁজতে গেলে বিড়ম্বিত হতে হয়; সেই ইঙ্গিতময়তা ও বহুস্তরীয় অর্থ উপন্যাসে সমগ্রে থাকে, বড়জোর একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে থাকতে পারে, বা, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে।

একইসঙ্গে এই নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত শব্দ-বাক্যকে বইতে হয় বস্তুভার ও প্রামাণিকতা; এবং সেই সূত্রেই দেশ ও কালের নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক।

সচেতন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ঔপন্যাসিককে যেমন এই স্থানাঙ্ক ছকে নিতে হয় বিষয় অনুযায়ী, তেমনই এই নির্দিষ্ট

স্থানাঙ্ক তৈরি হয়ে ওঠে ভাষার ব্যবহারে, ভাষার মাধ্যমে। ২০২০ সালের আগে বাংলা তথা ভারতের সাহিত্যজগতে কোভিড-উনিশ বা লকডাউন শব্দগুলো ছিল না, যেমন ছিল না ২০১৬ সালের আগে নোটবন্দি বা জিএসটি-র মতো শব্দ। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে পরিবহন শব্দটির বানান যেমন বদলে গেল, আগে শব্দটিতে দন্ত্য-ন ছিল, পরে সেটি মূর্ধন্য 'ণ' দিয়ে লেখা হচ্ছে। এখন এই সব শব্দ তাদের নির্দিষ্ট তারিখসহ সাহিত্যে প্রামাণিক হয়ে উঠছে। একেবারে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ মেপে, সূর্যের অয়নবিন্দুর চলন ছকে নিয়ে বাংলায় মহাউপন্যাস লেখা হয়েছে খুবই কম; বলা যায়, আক্ষরিক অর্থেই একেবারে হাতে গোনা। এবং সে গুনতি একটিমাত্র কড়-এই ফুরিয়ে যায়। দেবেশ রায়-এর আগে এরকম মহাউপন্যাস মাত্র দুটি—'গোরা' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। দেবেশ রায়-এর পর এখনও সেই সংখ্যা হাতেগোনাই—'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপুরাণ', 'প্রতিবেদন' এবং 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'।

দেবেশ রায়ের একেবারে শুরুর দিকের লেখাগুলোও প্রথম থেকেই উচ্চাঙ্গের। নির্দিষ্ট একটি স্তরের নীচে তাঁর লেখা সম্ভবই ছিল না। এই স্তর নির্দিষ্টতা তৈরি হয়ে উঠেছিল লেখক দেবেশ রায়ের ব্যক্তিত্ব ও মনন-এর স্বাতন্ত্রে; শিল্পের নান্দনিকতা অনুসন্ধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়াসে। তাঁর জীবনযাপন, তাঁর অভিজ্ঞতা—ব্যক্তি মানুষ ও রাজনৈতিক মানুষ হিসেবে; তাঁর পঠন অভ্যাস, তাঁর সম্পাদনার দায়িত্ব এবং সবচেয়ে তাৎপর্যময় তাঁর জীবনাগ্রহ ও দার্শনিক প্রস্থানভূমি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবহিতি তাঁর রচনাকে কখনোই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিশীল অবস্থান থেকে স্খলিত হতে দেয়নি। আর এই সামগ্রিক উপলব্ধির বোধ থেকেই তাঁর ভাষা অন্বেষণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। নতুন এক ভাষা, যা বিবৃত করবে

বর্তমান সময়ের সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্ত রকম সক্রিয়তাগুলির তাৎপর্য এবং প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের ঘামে রক্তে সজীব মানুষের বাস্তব জীবনকে। জীবনকে জীবনেরই মতো প্রতীয়মান করে তুলে তার মধ্যে থেকেই জায়মান সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতির লক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করা, ভাবীকালকে এ-কালের মধ্যেই স্থান দেওয়ার দুরূহ প্রচেষ্টায় তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের ভাষায় প্রাধান্য পেয়েছে দার্ঢ্য রস। আবার মহাকাব্যিক বিস্তারে সেই দার্ঢ্য রস অবশেষে রসপরিণতি পেয়েছে শান্ত রসে। অথচ উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ভাষাশিল্প; আর তাই তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে আধুনিক ভাষা। যে ভাষা মননের জটিলতা ও বস্তুর প্রত্যক্ষতা সমতুল্যভাবে প্রকাশ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে এই একমাত্র লেখক যিনি নিজের সৃষ্টিকর্মের প্রয়োজনে ও বিষয়ের চাপে ভাষাকে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন এমন এক আধুনিক ভাষা যা অর্জুনের ধনুর্বাণের থেকেও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদে সক্ষম।

(৩)

দেবেশ রায়ের ভাষা অনুসন্ধানের ধরতাইটা তাঁরই লেখা থেকে আমরা উদ্ধৃত করতে চাই—

“বাংলা গদ্যভাষার বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি হয়তো, অনেকদিন ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে-করতেই। গদ্যকর্মীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ, অনেক সময় ইতিহাসের সেই প্রত্যক্ষ থেকেই তাকে রশদ সংগ্রহ করতে হয়, উপকরণের রশদ।

যে-কোনো ভাষারই প্রধান শক্তি নিহিত থাকে তার সৃষ্টিশীলতায়। শব্দের পর শব্দ খুঁজে-খুজে নিজেই বোধ-বোধির গহনের সত্যকে

জানা ও মূর্ত হতে দেখার কঠিন বৃত্তিতে, সফলতা-বিফলতার কথা না ভেবেই সব শব্দকর্মীকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে তার কাছে শব্দের গোপন অর্থ ঝলসে ওঠে, শরীর থেকে সমস্ত অব্যবহিত সরিয়ে দিয়ে শব্দ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আদি প্রত্যয়ে শব্দের সহসা পুনরুদ্ধার ঘটে, যেন তার ওপর থেকে পরবর্তী ইতিহাস ঝরে গেছে। আবার, এর বিপরীতে, শব্দের উৎসকে তুচ্ছ করে ইতিহাসের অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন কর্মময় ব্যবহারের স্পর্শে শব্দের শরীরে ভাস্কর্য ফোটে, শব্দের সমস্ত গোপনতা খসে যায়।

কিন্তু গদ্যকর্মীকে এই ভাষার ইতিহাস বহন করতে হয় তার প্রতিটি বাক্যে। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতায় ভাষারূপে, কোনো বিমূর্তনের চেষ্টায়, এমনকি, কোনো নিছক বিবরণেও আজকের গদ্য তার শতাব্দী-শতাব্দী ধরে আসা ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।”

কিন্তু এই লেখার অন্তত এগারো বছর আগে তিনি লিখছেন—

“একজন ভাষাশিল্পী তাঁর শিল্পের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিজের জন্য এমন একটা প্রকরণ বেছে নিতে পারেন, যে প্রকরণের সঙ্গে ওই ভিড়ের ভাষা বা ভাষার ভিড়ের একটা শারীরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়... ভাষায় বিচ্ছিন্নতার সাধনা কখনো-কখনো, ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দেয়, জন্ম দিতে পারে।”

আবার, এই লেখার আট বছর পর, প্রথম উদ্ধৃতির তিন বছর আগে লেখা—

“লেখাটাই হয়ে উঠবে একটা দুর্গের মতো, তার গড়নে থাকবে প্রধানত আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাকার, তার মিনারে থাকবে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত প্রহরা, তার জীবনযাত্রা হবে এমন যে অবরোধের মধ্যেও তা অব্যাহত থাকবে, খবরের কাগজের পঠনাভ্যাস সেখানে

প্রতিহত হতে থাকবে, শব্দের অভ্যস্ত পরিচয় ভেঙে যাবে। লেখা কেন হয়ে উঠবে না এমনই দুর্গ, যেখানে পাঠককেও ঢুকতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে। পুরো সেতুর বদলে মাত্র আধখানা সেতুই কখনো-কখনো, যেমন এখন, হয়ে উঠতে পারে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। কেউ-কেউ তো সেই উপায়টি বেছে নিতে পারেন। দুর্বোধ্যতা তো কখনও, কোনো সময়ে লেখাটিকে বাঁচিয়েও দিতে পারে।”

প্রথম উদ্ধৃতিটি দেবেশ রায়ের গবেষণামূলক মহাগ্রন্থ ‘উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য’ থেকে নেওয়া। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিশ্ছিদ্র পেষণে সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলা ভাষা থেকে পরবর্তী বাংলা ভাষা কেমন ভাবে ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাহীন ছিন্ন হয়ে গেল; সমাজ বিকাশের অনিবার্য চাপে ক্রমাগত ভাষাচর্চার আলোড়ন, সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিস্ফারে ও কিছু ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধি বাংলা ভাষাকে তৎপরবর্তীকালে কীভাবে সুগঠিত করে তুলল তার জন্মকালীন বিকৃতিমহই; সংবাদ-সাময়িকপত্রে ব্যবহারযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে কীভাবে ভাষায় বা গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার ক্রমশ সংহত হয়ে এল; বাংলা গদ্যের বাক্যের ভেতর কেমনভাবে নির্দিষ্ট হতে থাকল ক্রিয়াপদের স্থান, বিশেষ্য-বিশেষণের সম্পর্ক, কর্তা-ক্রিয়ার সংযোগ, সর্বনামের অর্থ—এই সমস্ত নিয়ে সমুদ্রমন্থনতুল্য ধারণাসম্ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই গ্রন্থে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি কমলকুমার মজুমদার-এর সম্পর্কে লেখা ‘অভিনব ব্রতকথা’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। যেখানে প্রবন্ধের প্রায় শুরুতেই দেবেশ রায় লিখছেন “বাংলা কথাসাহিত্যে এই একজন লেখক যার কোনো লেখার বিচার সাহিত্যের মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত না করে করাই সম্ভব নয়, কারণ তাঁর কর্মটাই এমন, যেখানে একটি কমা চিহ্ন বা একটি সংযোজক অব্যয় (‘বা’) ব্যবহারের পেছনে তাঁর

লেখক হিসেবে সম্পূর্ণ উপস্থিতিও কাজ করছে।”

তৃতীয় উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে থিওডর ডব্লিউ অ্যাডরনো সম্পর্কে লেখা ‘শিল্পের জনসংযোগ’ প্রবন্ধ থেকে। অ্যাডরনোর লেখার বিশিষ্টতা নিয়ে ওই প্রবন্ধেই তিনি লিখছেন—“তিনি কোনো ‘টার্ম’ বা তাঁর ব্যবহৃত পদের সংজ্ঞা দেন না। একই পদ নানা অর্থে ব্যবহার করে যান। কারণ যে শব্দটিকে তিনি ‘পদ’ বা ‘টার্ম’ হিসেবে ব্যবহার করছেন সেই শব্দটি তো ভাষার অন্যান্য শব্দের মতোই বহু যুগের বহু অর্থে দ্যুতিগর্ভ হয়ে আছে। একই শব্দের ভিতরে অনেক অর্থের দ্যুতি নিহিত থাকে বলেই তো শব্দ এমন বহু অন্বয়ময় হয়ে উঠতে পারে। শব্দ থেকে এই ‘মিথিক্যাল রিমাইন্ডার’, স্মৃতির অবশেষটুকু মুছে দিয়ে তাকে যদি গাণিতিক বিভাগের পরিভাষাতুল্য করে ফেলা হয় তা হলে তো শব্দ তার সত্য থেকে চ্যুত হবে।”

দেবেশ রায়ের বাংলা গদ্য ও উপন্যাস সম্পর্কিত ভাষাচিন্তা নিয়ে বিবর্তনের পর্যায়ক্রম বুঝবার সুবিধের জন্য আগের তিনটি উদ্ধৃতি ও উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও উদ্ধৃতিগুলোর সামগ্রিক তাৎপর্য বোঝার জন্য উল্লিখিত রচনাগুলো সম্পূর্ণত অধিগত থাকা প্রয়োজন। এবার ওই পর্যায়ক্রমের বিবর্তন বোঝার জন্য ২০১৭ সালের লেখা থেকে একটি প্যারা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে ‘উপন্যাসের বিবিধ সংকট’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাষার সংকট’ প্রবন্ধটি থেকে।

“উপন্যাস নিয়ে যে-কোনো কথাই আসলে উপন্যাসের ভাষা নিয়ে কথা। ভাষার বাইরে কোথাও উপন্যাস নেই। ভাষাই উপন্যাস। উপন্যাসের কোনো বিষয় হয় না, কোনো গল্প হয় না, উপন্যাসের কোনো ঘটনা হয় না, ঘটনা থেকে সমস্যা তৈরি হয় না, সমস্যার নিরসন হয় না। উপন্যাস কোনো ভাবেই কোনো সামাজিক ব্যক্তিগত জীবনের অক্ষরে পুনর্নির্মাণ নয়। উপন্যাস ভাষার একটি স্বাধীন

সংগঠন। উপন্যাসের কোনো ঘটনার ঔচিত্য বা বাস্তবতা বা উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কথা ওঠে, তখন উপন্যাসকে শুধুই নথি বা এফআইআর-এর মতো একটি দলিল বলে বিবেচনা করা হয়। এই বিভ্রান্তিতেই উপন্যাসের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় উপন্যাসের বিষয়, এক-একটি চরিত্রের প্রতিনিধিত্বের হদিশ, বাস্তবতা বলে অনস্তিত্বের সন্ধান। আর, একবারের জন্যও ওঠে না ভাষার কথা। অথচ ভাষার বাইরে কোথাও উপন্যাস থাকতেই পারে না।”

(৪)

আজকাল যখন বাংলা ভাষায় এত এত লেখা হয়, এত দৈনিকপত্র, এত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, এত এত গবেষণাপত্র তৈরি হয়, এত লেখকেরা লেখেন, এত পাঠকরা পড়েন, এত সভাসমিতি এত লাইব্রেরি; তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য গড়ে ওঠার সেই আদিযুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে একই অভিযোগ বা অস্বস্তি বারবার প্রকাশ করা হয়। বাংলা ক্রিয়াপদের স্বল্পতা নিয়ে, বাংলা বাক্যের ‘দুর্বলতা’ সম্পর্কে সংস্কারটা প্রচলিত হয়েছে প্রধানত ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে বা কখনো-কখনো সংস্কৃত বাক্যের সঙ্গেও তুলনা থেকে। তাতে প্রথমেই ধরা পড়ে বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা। সে দুর্বলতার একটা প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় বাংলা ক্রিয়াপদের স্বল্পতা ও তার ফলে মাত্র কয়েকটি ক্রিয়াপদ দিয়ে অনেক ক্রিয়া সম্পাদনের বাধ্যতা। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়—বাংলায় ‘সিগারেট খাওয়া হয়’, ‘ভাত খাওয়া হয়’, ‘ডাল খাওয়া হয়’, ‘পুজো করা হয়’, ‘রান্না করা হয়’, ‘রাগ করা হয়’, ‘গান করা হয়’, ‘চোট লাগে’, ‘কাজে লাগে’, ‘সুর লাগে’, ‘গুলি লাগে’। এ রকম উদাহরণ বাড়ানো যায়।

বাংলায় বাক্যগঠনের এই ‘দুর্বলতা’ বা ‘পুনরাবৃত্তিদোষ’ এড়াবার জন্য অনেক সময় ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে বাক্য তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তো তাঁর গদ্যরচনায় ক্রিয়াপদহীন বাক্যরচনাকে প্রায় একটা স্টাইলে পরিণত করেছিলেন। তাতে বাধ্যতই নানা ধরনের প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। বাংলা ক্রিয়াপদের সংখ্যাল্পতা এবং এক ক্রিয়া দিয়ে অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করার অভিযোগ যথার্থ নয়। বাংলা ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে অসমপিকা ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে অচেতনতা থেকেই এই ধরনের অভিযোগ তৈরি হয়। সংস্কৃতে ক্রিয়ার সংখ্যা, একটি ধাতু থেকে একাধিক ক্রিয়াপদের জনন ক্ষমতা ও ধাতুর শ্রেণিবিশ্লেষণ অত্যন্ত নির্দিষ্ট। ইংরেজিতে বিশেষ্যকে ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা সহজ, তাই একই শব্দ বিশেষ্যও বটে, ক্রিয়াও বটে। ধাতুগত ক্রিয়ার সংখ্যা ইংরেজিতেও খুব বেশি নয়, কিন্তু সে-কারণে ইংরেজিতে ক্রিয়াপদের সংখ্যাল্পতা ঘটে না, কারণ সেখানে বিশেষ্য থেকে ক্রিয়া তৈরির বিকল্প ব্যবস্থাটাই বেশি সক্রিয়। এদিকে, সংস্কৃত ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বহুলতা বাংলা পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি।

বাংলায় ক্রিয়াপদের স্বল্পতা সম্পর্কে কুসংস্কারের একটা প্রধান কারণ বাংলা লেখকরা বাংলা ক্রিয়পদ সম্পর্কে সচেতন নন, আর মৌখিক বাংলায় যে বিচিত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তা লেখার বাংলায় আসে না। সংস্কৃতে পাণিনির গণনা অনুযায়ী ধাতুর সংখ্যা ২০০০ হলেও, সাহিত্যে ৮০০-র সামান্য বেশি এসেছে। এই ৮০০-র মধ্যে মাত্র ৫০০টি বৈদিক সাহিত্যে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। ১০০টি আছে শুধুই সংস্কৃত সাহিত্যে।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ বাংলায় ১০৫৬টি ধাতু নির্দেশ করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধান থেকে ১৫০০ ধাতুর একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন।

বাংলায় ক্রিয়াপদের সংখ্যার কোনো স্বল্পতা নেই। কিন্তু লেখকরা

সেই মৌখিক ক্রিয়াপদগুলোকেও গদ্যে ব্যবহার করতে পারেননি। বাংলা বাক্যের এই তথাকথিত দুর্বলতা লেখকের দুর্বলতা, ভাষার দুর্বলতা নয়। এই বিষয়টি প্রথম স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন দেবেশ রায় তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ‘উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য’ বইটিতে। এবার এই বইটি থেকে এ বিষয়ে দেবেশ রায়ের উদ্ধৃতি নেব—

“অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাংলায় ক্রিয়াগুলির কালপরম্পরা ও পারস্পরিক সংযোগ বোঝানো হয়। ‘আমি স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন এসে গেছে।’ এই বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া—‘দেখি’ ও ‘এসে গেছে’। অসমাপিকা একটি—‘গিয়ে’। এই অসমাপিকাটি ‘আমার যাওয়া’ আর ‘ট্রেন আসা’ এই দুটি কাজের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তা বোঝাচ্ছে। ‘এসে গেছে’ পদটি যৌগিক ক্রিয়া। কখনো-কখনো অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে এরকম একটি অর্থবাচক ক্রিয়া (যৌগিক ক্রিয়া) তৈরি করা হয়—দাঁড়িয়ে পড়া, দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঘুমিয়ে পড়া, ঘুমিয়ে থাকা, ঘুমিয়ে যাওয়া, খুঁজতে যাওয়া, খুঁজতে থাকা, বেরিয়ে পড়া, বেরিয়ে যাওয়া, বেড়িয়ে আসা, বেড়াতে বেরোনো, পড়তে বসা, পড়তে থাকা, পড়তে যাওয়া ইত্যাদি। বাংলা ভাষার যৌগিক ক্রিয়ায় অল্পসংখ্যক সমাপিকা ক্রিয়া কর্মবোধক অসমাপিকার সঙ্গে মিলে, শব্দার্থের নানা সূক্ষ্ম অর্থভেদ ঘটায়, ইংরেজিতে প্রিপোজিশন যেমন ঘটাতে পারে।

অসমাপিকার আর একটি ব্যবহার—তার পুনরাবৃত্তিতে সময়ের একটা ধারাবাহিকতা বোঝানো যায়—‘খুঁজতে-খুঁজতে ঠিকানাটা পেয়ে গেলাম’, ‘রেস খেলতে-খেলতে লোকটার সর্বস্ব গেল’। প্রথম বাক্যটিতে সময়সীমা বেশ ছোটো, দ্বিতীয় বাক্য বেশ দীর্ঘ। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার একই ধরনের পুনরাবৃত্তি এই সময়সীমা বুঝিয়ে দেয়। শুধু ঘটনার কালসীমাই নয়, ক্রিয়ার সম্পাদন বৈশিষ্ট্যও কোনো

কোনো সময় অসমাপিকার পুনরাবৃত্তিতে বোঝানো যায়—‘খাটতে খাটতে জান জেরবার হয়ে গেল’, ‘ধুঁকতে-ধুঁকতেও চালিয়ে যাচ্ছে’, ‘মই দিতে দিতে শেষে মাটির পিণ্ডগুলো ভাঙল’, ‘গিয়ার মারতে মারতেই তো কলকাতার রাস্তার ড্রাইভারের হাত ব্যথা’। ক্রিয়ার বিশেষ ধরন বোঝানোর জন্য অসমাপিকার এই পুনরাবৃত্তিরও রকমফের ঘটে। প্রথমে মূল অর্থবোধক অসমাপিকা ব্যবহার করে পরে তার সঙ্গে অনুকার শব্দ মিলিয়ে একটা পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। এখন অবশ্য বহু ব্যবহারে এর অনেকগুলি একটিমাত্র শব্দ হিসেবেই বিবেচিত হয়। ‘বুঝেশুনে’, ‘খেয়েদেয়ে’, ‘মেরেধরে’, ‘কেঁদেকেটে’, ‘জিরিয়েটিরিয়ে’, ‘ঝাড়লেঝুড়লে’। এগুলি কাল (টেন্স) অনুযায়ী পরিবর্তিতও হয় ও সেখানেও এই পুনরাবৃত্তি ঘটে—‘খাবে-দাবে’, ‘খেল-দেল’, ‘মারবে-ধরবে’, ‘মারল-ধরল’ ইত্যাদি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থে এই অসমাপিকা ক্রিয়াকে একটি পদ হিসেবে না দেখে ‘সংযোজক’, ‘অসমাপিকা’ ইত্যাদি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার, এর ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি এগুলিকে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপভেদের সঙ্গে মিলিয়েছেন। আমরা এই সবগুলিকেই একই অসমাপিকার বহু প্রয়োগ বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসেবে নিতে চাই।

অসমাপিকা ক্রিয়ার অভাবিত ব্যবহার বাংলা বাক্যকে বিচিত্র সামর্থ্য দেয়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বাংলা বাক্যের এতই নিজস্ব যে ইংরেজি বা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়ে এর ব্যবহার বৈচিত্র্য বুঝে ওঠা যায় না। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষার কোনো গঠন-উপকরণকে অসমাপিকার কাজে ব্যবহারও করা যায় না। বাংলা ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শে। তাই অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো এমন বিশিষ্ট বাংলা রীতিকে ব্যাকরণে

নির্দিষ্ট করার জন্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, ডুপলিকেটেড ভার্ব, কম্পাউন্ড ভার্ব ইত্যাদি ইংরেজি ব্যাকরণসম্মত ভাগে অসমাপিকাকে ভাগ করতে হয়েছে।

ইংরেজি বাক্যের গঠন রীতি, কর্তা>ক্রিয়া>কর্ম, এই পরম্পরায় অপরিবর্তনীয় রূপে বাঁধা। এই পরম্পরার মধ্যেই সাব-অর্ডিনেট ক্লজ বা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বড়ো বড়ো বাক্যাংশ ঢুকতে পারে। ইংরেজি বাক্যের এই গঠনরীতি দিয়ে অসমাপিকানির্ভর বাংলা বাক্যকে বুঝে ওঠা দুরূহ। বস্তুত ইংরেজি বাক্য গঠনরীতি অনুযায়ী বাংলা-অজ্ঞ কেউ যদি বাংলা বাক্যকে পরীক্ষা করেন তা হলে তাঁর কাছে বাংলা বাক্যটিকে বিপর্যস্ত মনে হবে।

অন্যদিকে, সংস্কৃত বাক্য গঠনরীতিতে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের সম্পর্ক কারক-অনুযায়ী বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা এতই অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যে বাক্যের মধ্যে পদের স্থান পরিবর্তনেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। বাংলায় বিভক্তি চিহ্ন সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, বস্তুত স্বতন্ত্র শব্দ দিয়েই বাংলায় বিভক্তির কাজ সারা হয়—বিভক্তি চিহ্ন পদের অপরিত্যাজ্য কোনো অংশ নয়। ফলে, বাংলা অজ্ঞ কেউ যদি সংস্কৃত বাক্যের গঠনরীতি অনুযায়ী বাংলা বাক্য পরীক্ষা করেন তা হলে তাঁর কাছে বাংলা বাক্যটিকে অর্থহীন মনে হবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের ভিতরে যে কাজগুলো করতে পারত, অসমাপিকা ব্যবহার না করে সেগুলো নিষ্পন্ন করতে পণ্ডিতরা সংস্কৃত রচনারীতির সমাসসন্ধিবহুল, অনেক সময় প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ পদের ব্যবহার ঘটালেন। এই ধরনের বিশেষণ পদ একটিমাত্র শব্দ হওয়ায় ও তার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ায় সাহেবদের পক্ষে এই বিশেষণের ব্যবহার বুঝে ওঠা সহজতর ছিল। ‘মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে আসছে’, ‘রোরুদ্যমানা মেয়েটি আসছে’—এই দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথমটি, বাংলা যিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে

কঠিন। কারণ ‘কাঁদতে-কাঁদতে’ এই অসমাপিকা পদটি ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে না কর্তাকে বোঝাচ্ছে এটা তিনি সহজে ধরতে নাও পারেন। তাঁর কাছে পরের বাক্যটির ‘রোরুদ্যমানা’র সঙ্গে ‘মেয়েটি’র সম্বন্ধ সহজবোধ্য। কিন্তু শুধুই বাংলায় কথা বলেন এমন কারও পক্ষে দ্বিতীয় বাক্যটি কঠিনতর, কারণ সেখানে শব্দার্থ ও বিশেষণের লিঙ্গ জানার সমস্যা আছে।”

ভাষাজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় ও নির্ভুলতায় দেবেশ রায় এভাবেই ভেঙে ফেলেন বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও প্রচারিত এক লোকশ্রুতিকে। একই সঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন নতুন এক মিথ; বাংলা গদ্যের ধারণক্ষমতা, নমনীয়তা, রূপবৈচিত্র্য এমন যে মনন আর কল্পনার, অনুভব-উপলব্ধির ভুবনের কোনো কিছুই তার প্রকাশক্ষমতার অতীত নয়।

আমরা এই রচনায় দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ভাষা নিয়ে তাঁর ভাবনার গতিরেখা ও বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু অনুমান করতে চেয়েছি; একই সঙ্গে গদ্যভাষার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণার কিছু উদাহরণ রেখেছি। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক ভাবনাচিন্তার ও লেখায় তার প্রয়োগের ফলে কীভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্য এবং বিশেষত উপন্যাস সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পর নতুন ভাষা আবিষ্কার করতে সক্ষম হল সেই আলোচনা তো এখনও শুরুই হয়নি। আর, বিশ্ব উপন্যাস সাহিত্যে স্বীকৃত উপন্যাসের একটি মূলগত সংজ্ঞা—মানবের আত্মবিকাশের বিবরণই উপন্যাস—এই সংজ্ঞাটিকেই তিনি কীভাবে বদলে করলেন—এই প্রাক্তন উপনিবেশের দেশের সবকিছু উলটে যাওয়া সমাজ-অর্থ-রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হল—ব্যক্তির বিনষ্টি, এবং সে কারণেই নতুন ও প্রকৃত অর্থে আধুনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা হওয়া উচিত—ব্যক্তির বিনষ্টির বিবরণই উপন্যাস। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরু হলে

আমরা দেখতে পেতাম এ ক্ষেত্রেও দেবেশ রায় উপন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত আরও একটি মিথকে ভাঙছেন এবং তাঁরই সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন করে একটি অতিকথার জন্ম দিচ্ছেন। যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ভবিষ্যতের গর্ভেই আপাতত থেকে যাচ্ছে, তাই, একেবারে সাম্প্রতিক, উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে তাঁর একটি বিচ্ছিন্ন রচনাংশ দিয়ে এই লেখাটি শেষ করতে চাইছি।

"বাংলা কাগজগুলো, প্রায় প্রত্যেক কাগজই, তাঁদের সাংবাদিকদের এক-একটি আসনের (বিধানসভা) সংশ্লিষ্ট এলাকার একেবারে অভ্যন্তরে পাঠান। এমন বাছাইয়ের কারণ নিশ্চয়ই থাকে। কোনো জায়গায় বহু পুরানো অভিযোগের প্রতিকার না-হওয়ায় ভোটাররা বেঁকে বসেছেন। কোথাও-বা পারিবারিক পাকা আসন ও চলাফেরার আদবকায়দা ভোটারদের পক্ষে বাধা হয়ে উঠছে। কোথাও-বা বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় গ্রামের টিনের চালে একাত্তরের খান-সেনাদের গুলির ফুটো। কোথাও-বা দুই স্বাধীন দেশকে স্বাধীন রেখে নীলফামারির দিকে ট্রেন চলে যাচ্ছে। নীলফামারি। নীলমণির হাট। লালমণির হাট। এক লুপ্ত মানচিত্রের চিরন্তনতা। বালুরঘাট। আত্রেয়ী নদী।

আর সাংবাদিকরা লেখেন এমন ভাষায় যা কোনো সংবাদ দিতে চায় না, একটা জীবনযাত্রাকে তার প্রতিদিনে তুলে আনতে চায়। জায়গার নাম, মানুষের নাম, খালবিলের নাম দিয়ে যেন একটা গোটা দেশ নির্মিত হতে থাকে। একেবারে উপন্যাসের ভাষা, যা এতটাই আধুনিক ও চিত্রল যে, কোনো একটি ঘটনার অনুসরণের দায় থেকে মুক্ত। বাংলার ঔপন্যাসিকরা যদি সাংবাদিকদের এই লেখাগুলো থেকে একটু শিখে নিতে পারতেন আধুনিক উপন্যাসের ভাষা!"

দায়বদ্ধতার ভাষা

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

দেবেশ রায়ের একটা স্বভাব ছিলো। যখন কোনো বই বেরোত ওঁর, তিনি উৎসর্গপৃষ্ঠায় একটা করে ছোট কবিতার অংশ, মূলত বিদেশি কবিদের লেখা ক্লাসিক্যাল কবিতার অংশ, তুলে দিতেন। ছোট ছোট। দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রে এই জিনিসটা খুবই দেখা যেত। যে গল্প খণ্ডগুলো বেরিয়েছিল, কোনওটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করছেন, কোনওটা আফসার আমেদকে বা কোনওটা নিজের পুত্রকে, সেখানে কোথাও পাস্তেরনাক থেকে বা ইলিয়ড থেকে বিভিন্ন কবিতার লাইন তুলে সেই উৎসর্গপত্রে লিখতেন। এই রকমই একটি গ্রন্থের সংগ্রহ স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং নিচে লিখেছিলেন If I should choose posterity where would you get contemporary fun? আমি যদি অমরত্বই প্রত্যাশা করি তাহলে সমসাময়িক মোহময়তা, সেটা তুমি কোথা থেকে পাবে? খুব ইন্টারেস্টিং ফাউস্ট-এর এই লাইন। ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে এই উক্তিটা হয়ত দেবেশ রায়কে কিছুটা বোঝায়—তিনি আমাদের সময়ে তর্কযোগ্যভাবে শ্রেষ্ঠ লেখক যিনি অমরত্বকেও অস্বীকার করতে রাজি ছিলেন, সমসময়িকতার মোহময়তা ত্যাগ না করবার জন্য।

এবার এই সমসময়িকতা দেবেশ রায়ের মধ্যে কীভাবে এসেছে

সেটা নিয়ে বলার আছে। একটা ঘটনা ঘটল আর দেবেশ রায় সেটাকে নিয়ে গল্প লিখলেন—ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়। দেবেশ রায় নিজেই বলেছেন যে ’৬২ সালের পর থেকে তাঁর গল্প আর বিশেষ কোনো ঘটনা থেকে রাজনৈতিক কল্পনা সর্বজনীনের সমাধান পাচ্ছিল না। দেবেশ রায় তখন একটা সংকটে পড়েন। শুধু তিনি নয়, আমরা আলোচনায় দেখব দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অসীম রায়, তাঁরা সকলেই এই সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু এই যে শুরুতে ফাউস্ত থেকে উক্তিটার উল্লেখ, তার কারণ হল দেবেশ রায়কে বুঝতে গেলে এই দায়বদ্ধতাকে জানতে হবে। তাকে ধরতে হবে। এই দায়বদ্ধতার যে ভাষা, তাকে ধরতে হবে। এই দায়বদ্ধতার উদ্দিষ্ট সমসময়। সমসাময়িক সমাজ, সমসাময়িকতার ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা। তার মানে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়বদ্ধতা না-ও হতে পারে। যদিও দেবেশ রায়ের তাও ছিল, কিন্তু শুধু তাই-ই ছিল না। তার মানে এই নয় যে কোনো একটা ঘটনা ঘটছে এবং সেই ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরতে হবে। তাকে দায়বদ্ধতা বলেওনা। এই কমিটমেন্ট ইতিহাসের প্রতি। কারণ দেবেশ রায় বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন যে তাঁর কাছে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তিনি যে অর্থে কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলছেন সেই কমিউনিস্ট পার্টিকে কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন হিসেবে তিনি বলছেন না। কমিউনিস্ট পার্টি একটা সার্বিক চেতনা হিসেবে তাঁর কাছে আসছে। এটা হচ্ছে একটা পরিবৃত্ত। এক সামগ্রিক যাপনের পরিবৃত্ত। যে পরিবৃত্তের মধ্যে একসঙ্গে একটা কমিউনিটি তৈরি হয়, গড়ে ওঠে, একসঙ্গে স্বপ্ন দেখে এবং এখন বলা যেতেই পারে যে একসইঙ্গে মরেও যায়। তো এই পরিবৃত্ত, এই সামগ্রিকতা, এই যৌথতার যে অস্তিত্ব, তা দেবেশ রায়কে সারা জীবন তাড়া করে গেছে। তাঁর প্রত্যেকটা

লেখায় এই কমিটমেন্টের ভাষা উঠে এসেছে. কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে। আবারও, এই কমিউনিস্ট পার্টির অর্থ কোনো একক রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এখানে পার্টি একটা সার্বিক ব্যাপার, একটা ব্যাপ্ত ব্যাপার। এখানে পার্টি মানে মানুষের চেতনা, যে কারণে দেবেশ রায় যখন সুচিত্রা মিত্রর গলায় 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' শুনছেন, তখন সেই গলার অন্তর্লীন বিষাদ তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ঠিক একই সময়ে ভারতবর্ষে যে '৪৩ এর মন্বন্তর হয়েছিল সেই মন্বন্তরে বহু মানুষের মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে হত্যা, যাকে হত্যাই বলা যায়। এই শয়ে শয়ে মানুষের হনন যেন সুচিত্রা মিত্রর গলায় বিষাদ হয়ে ভর করেছিল। দেবেশ রায়ের রাজনীতি এই মনে হবার জায়গায় দাঁড়িয়ে। দেবেশ রায় যখন দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় শোনেন 'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিলো তারা', এটা তিনিই অনেকবার অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছে যে 'আর কি কখনও কবে এমনও সন্ধ্যা হবে'। যেন কোথাও গিয়ে নকশাল আন্দোলনের অভিঘাতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যে সন্ধ্যায় বহু তরুণ হয়ত বনে চলে গিয়েছিল। যাদের লাশ শুয়ে আছে। যাদের উপর পড়ে আছে চৈত্রের কাফন, এবং সেই সন্ধ্যা আর কখনও আসবে না। তার অবসান ঘটে গেছে। মনে রাখতে হবে দেবেশ রায় দলগতভাবে যে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা কিন্তু নকশাল আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

তো এই যে সামগ্রিক চেতনা, এটাই তাঁর কাছে কমিউনিস্ট পার্টি, এবং কমিউনিস্ট পার্টি তাকে এই দায়বদ্ধতার ভাষা দিয়েছিল। কারণ রাজনীতি মানে তো আমাদের এই দৈনন্দিনের অন্দরে ও অন্তরে একটা স্বপ্নের সঞ্চার। তার পর সেই স্বপ্নকে দৈনন্দিন করে তোলার ইচ্ছে আর কাজ। একদিকে স্বপ্নের সঞ্চার, আবার সেই স্বপ্নকেই দৈনন্দিন করে তোলার কর্তব্য। এই দুই মিলিয়েই রাজনীতি। স্বপ্ন

যে দেখতে পারে সে যে সেই স্বপ্ন নিজের মধ্যে সঞ্চারিতও করতে পারবে তা তো সব সময় হয় না, স্বপ্নেরও রাজনীতি থাকে। আবার যদি কেউ সেই স্বপ্নের সঞ্চার ঘটাতে পারে তাহলেও তার ইচ্ছের সেই জোর তৈরি নাও হতে পারে, কারণ তার ইচ্ছেরও তো রাজনীতি থাকে। আর যদি ইচ্ছে তৈরি হয় বা না-ও হয় তাহলেও কর্মের ব্রত সকলে নাও নিতে পারে কারণ কর্মেরও একটা রাজনীতি আছে। কিন্তু এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা, এটা দেবেশ রায়ের কাছে রাজনীতি, এবং যখন দেবেশ রায় গল্প লিখছেন, মূলত ’৬২ থেকে ’৬৭ সালের মধ্যে লেখা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলো-প্রথম জীবনের ‘নিরস্ত্রীকরণ কেন’ অথবা ‘দুপুর’ অথবা ‘উদ্বাস্তু’, ‘বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব’ এই সব গল্পগুলো যখন আসছে, তখন দেখা যাচ্ছে, যে ওই সময়ে দলীয় রাজনীতির একটা বাধ্যতা, সংসদীয় রাজনীতির নিয়ম, কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় রাজনীতির পরিবৃত্তে ঢুকে পড়ছে বেশি করে, ’৬৭ সাল আসছে, সেখানে সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় যত তাঁকে দৈনন্দিন কাজের ভেতর ঢুকতে হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন করতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গে, তত তাঁর গল্পগুলোর বাক্য জটিল হয়ে উঠছে। প্রত্যক্ষ ঘটনা ততই পরোক্ষের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাই রাজনীতি থেকে কোনো দ্বন্দ্বহীন রূপকের নিরাপত্তা তৈরি হয়নি। যেটা আজকাল বহু উপন্যাসে হয় এবং তা দেখতে দেখতে এবং সে দেখার পৌনঃপুনিকতায় আমরা, যাকে বলে, হেজে গেছি। রাজনীতির বাস্তব অভিজ্ঞতা রূপককে অতিক্রম করতে চাইছে। কী হচ্ছে তার থেকে বেশি গুরূত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কী হতে পারত অথবা কী হওয়া উচিৎ ছিল। সেই গল্পের ভাষা সেইজন্য বাস্তব থেকে ঠেলে, বাস্তবোত্তর হয়ে উঠতে চাইছে। দেবেশ রায়ের দায়বদ্ধতার ভাষা নিয়ে যখন আমরা ভাবতে যাবো, তখন দেবেশ রায়ের রাজনীতিকে এবং সমসাময়িক রাজনীতিকে আলাদা করে পড়া যাবে না, এবং

তার পরেও সমসাময়িকতাকে তিনি ছাপিয়ে যাবেন সেই দায়বদ্ধতা দিয়েই।

ধরা যাক দেবেশ রায়ের খুব বিখ্যাত গল্প 'নিরস্ত্রীকরণ কেন'। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' লেখা হচ্ছে ১৯৬২ সালে। সালটা গুরুত্বপূর্ণ, যখন পার্টি ভাগ হচ্ছে, ভারত-চিন দ্বন্দ্ব সামনে আসছে এবং ১৯৫৬ সালে ঘটে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশতি পার্টি কংগ্রেস, স্ট্যালিন নিয়ে একটা বিরাট ধাক্কা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে চলে এসেছে, সোভিয়েত বনাম চিন ভাঙন এসেছে। আবার একই দিকে ১৯৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টির সরকার গঠন হয়েছে। '৬২ সালে একটা ভোট হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং আত্মবিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টি সেই ভোটে প্রথম রাজ্যে বিকল্প সরকার গড়ার স্লোগান দিয়েছিল। সেটা ফেব্রুয়ারি মাস। আর সেই অক্টোবরেই চিন এসে গেল আসাম সীমান্তে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে গেল। এই সময় দাঁড়িয়ে 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পটা লেখা হচ্ছে। গল্পটা খুবই বিখ্যাত। একটি চলন্ত ট্রেনের কামরায় বহু মানুষ ও দরজায় ঝুলতে থাকা এক আগন্তুক, যে অসহায়ভাবে চিৎকার করছে তাকে কামরার ভিতর ঢোকানোর জন্য কিন্তু তাকে ঢোকানো হলো না এবং সেই গল্পটার শেষ হচ্ছে এইভাবে, 'ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকারে থেকে যারা একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি ও হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আর এক মানুষের গন্তব্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু মানুষগুলোই বদলে যাওয়ায় গন্তব্যও আর স্থির থাকেনি'। আমি যখন এটা ২০২০ সালের একজন লেখক হয়ে পড়ছি, তখন আমার কাছে তো এটা পুরো কমিউনিস্ট পার্টির একটা অধ্যায় এবং ভাঙনের একটা আখ্যান বলে বলে মনে হচ্ছে। মানুষগুলো পাল্টে গেল। গন্তব্যও পাল্টে যাচ্ছে। বহু মানুষ একই গাড়িতে একসঙ্গে উঠেছিল একই জায়গায়

যাবে বলে কিন্তু মানুষও পাল্টে যাচ্ছে, গন্তব্যও পাল্টে যাচ্ছে। এবং দেবেশ রায় নিজেই বলছেন ’৬২-র পর থেকে তাঁর গল্প আর বিশেষ ঘটনা থেকে রাজনৈতিক কল্পনার সর্বজনীন সমাধান পাচ্ছে না এবং যে বিশাল ভাঙন, এবং তার আগে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অনুপ্রবেশ তার পরে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙচুর, সেই যে বিশাল ঘটনপ্রবাহ তাকে তিনি শুধু গল্পে ধরতে পারছেন না, আর সেই কারণে উপন্যাসে আসছেন। গল্পের ভাষা আর উপন্যাসের ভাষা তো আলাদা হয়, যেটা আজকাল বেশিরভাগ সাহিত্যের নামে যা লেখা হয় বাংলা সাহিত্যে তারা মনে রাখবে না—গল্পের ভাষা আর উপন্যাসের ভাষা, প্রবন্ধের ভাষা প্রত্যেকটা আলাদা, প্রত্যেকটা গদ্যভঙ্গি আলাদা। এবং দেবেশ রায় একজন গদ্য শিল্পী হিসেবে জানেন যে তিনি গল্পের ভাষায় এই বিশালতা ধরতে পারবেন না। তাঁকে যেতে হচ্ছে উপন্যাসে এবং মনে রাখতে হবে যে ’৬৩ থেকে ’৬৫-র মধ্যে লিখে ফেলছেন প্রথম উপন্যাস ‘মানুষ খুন করে কেন’, প্রথম খশড়াটা লেখা হয়ে যাচ্ছে ’৬৩ থেকে ’৬৪ সালের মধ্যে। তার পর বহুবার সেটাকে পাল্টাবেন। কাটা ছেঁড়া করবেন। ‘যযাতি’ ’৬৪ সাল থেকে ’৬৮ সালের মধ্যে লেখা হয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রথম দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লেখা হয়ে যাচ্ছে এবং তা কিন্তু ’৬২ সালের পর থেকে। ’৬২ সালে ঐ ‘নিরস্ত্রীকরণ কেন’ এবং মানুষ এক থাকছে না, গন্তব্যও এক থাকছে না, সবই পাল্টে যাচ্ছে, একই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে ‘আজ দুজনার দুটি পথ যেন দুটি দিকে গেছে বেঁকে’—এই জায়গাটাকে দেবেশ রায় একটা সংকট হিসেবে দেখছেন। এবং তা শুধু দেবেশ রায়ের একার সংকট ছিলনা। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, বিশাল লেখক, দেবেশ রায় বলতেন তাঁর আত্মার আত্মীয়, তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছেন। দীপেন্দ্রনাথ সম্ভবত আত্মহত্যার

চেষ্টা করেছিলেন এবং সারা জীবনে কোনওদিন পার্টি ভাগ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর অকাল মৃত্যুর পিছনেও এটা একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর ছিল। তো দীপেন্দ্রনাথও সেই সংকটে ভেঙেচুরে যাচ্ছিলেন। অসীম রায়ও বলেছেন পার্টিতে ভাঙন না হলে তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠা হত না। এই যে দায়বদ্ধতার ভাষা, এই বিষয়টাকে বুঝতে গেলে সেই সময়কার পার্টির ভাঙন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, সরকারের পড়ে যাওয়া এবং তার ভিতর একজন কমিটেড শিল্পী বা একজন কমিটেড লেখক, তাঁর কী সংকট হচ্ছে সেটাকে বুঝতে হবে। তখনকার বামপন্থায় যে একটা ইউটোপিয়ান বন্ধন ছিল, যেটা আমাদের বহু কবি লেখকের মধ্যে ছিল, ধরা যাক পাঁচের দশক পর্যন্তও, সে দিনেশ দাস হোক, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেড়ে দিলাম, এঁদের পরেও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, যাঁরা কমিটেড, পার্টিঘনিষ্ঠ যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁদের ইউটোপিয়া কিছুটা ইউরোপিয় আধুনিকতা থেকেও এসেছিল। ১৯৬২ সালের পর থেকে সেই ইউটোপিয়া ভাঙতে শুরু করে। রূঢ় বাস্তবের অভিঘাতে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকম ছিল। দিনেশ দাস শিবির বদলে ফেলেন, এবং ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধে চিনের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আগেই বলেছি, প্রায় আত্মহননের রাস্তায় গিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা আমাদের সকলেরই জানা। দেবেশ রায় যা করলেন, তিনি আর গল্পের চৌহদ্দিতে আটকে থাকতে পারলেন না। তাঁকে উপন্যাসে যেতে হলো। এবং শুধু উপন্যাসেই যেতে হলো না, আর একটা জিনিস করতে হলো—এই যে বিশাল সর্বনাশ, সেই সর্বনাশ পার্টির সর্বনাশ, সেই সর্বনাশ ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জায়গায় সর্বনাশ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ধরলে, সেই সর্বনাশের মধ্যেই তাঁর জলপাইগুড়ি, রাজবংশী বন্ধুজন, তার মধ্যে প্রকৃতি,

রাজবংশী ভাষা, তিস্তা, চা-বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের লোকজন, ফরেস্টের জঙ্গল গাছপালা পশুপাখি, এক অদ্ভুত পৃথিবী, তা দেবেশ রায়ের পৃথিবীতে কায়েম হতে শুরু করল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে। এটাও কিন্তু একটা রাজনীতি।

এর আগে যদি দেবেশ রায়ের গল্পগুলো ধরা যায়, যে ১৯৬২ সালের আগে যে গল্পগুলো লিখেছিলেন বা '৬২ সালের পরেও বেশ কিছু গল্প, যেমন—'দুপুর', 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'মর্ত্যে পা', 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব', সেখানে কিন্তু এই উত্তরবঙ্গ খুব বেশি আসেনি। তারপরে যখন উত্তরবঙ্গ আসছে, সেই আসার পিছনে একটা রাজনীতি আছে। দেবেশ রায় উপন্যাসের যে ইউরোপিয়ান কাঠামো, তাকে অস্বীকার করতে চাইছেন বারবার। যে রাজনীতি তাঁকে সংকটের সামনে দাঁড় করিয়েছে, সেই সংকটের থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে, দেবেশ রায় আরো বেশি করে ঢুকে যাচ্ছেন লোকজীবনের মধ্যে। ডুয়ার্স, চা বাগান, তার শ্রমিক—বাঘারু, খেতখেতু, চ্যারকেটু, এই চরিত্রগুলোর মধ্যে। একে সাবঅলটার্ন বলতে আমি রাজি নই তার কারণ হচ্ছে, সাবলটার্ন আমরা যে হিসেবে বা যে অর্থে বলি, দেবেশ রায় সেই হিসেবে সাবঅলটার্ন উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু তিনি যেটা করলেন, ইউরোপিয়ান উপন্যাস কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজস্ব উপন্যাস কাঠামো খুঁজতে চাইলেন। কতটা সফল হলেন কিংবা হলেন না সেই প্রশ্নে যাচ্ছি না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তারপর থেকেই দেবেশ রায় বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তার মধ্যে একটা প্রধান উপন্যাস, 'মফস্বলী বৃত্তান্ত'। এই 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৪ সাল নাগাদ। যদি ভুল না করি, ১৯৭৪ সালে লেখা হয়েছিল এবং তারপর উপন্যাসটা বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়েছিল। সম্ভবত 'দেশ'-এও বেরিয়েছে কিছু অংশ, 'কালান্তর'-এ বেরিয়েছে, এরকম।

১৯৮০ সালে মনে হয় উপন্যাসটা সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ পায়। তো, এই উপন্যাসটা উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামের কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে। খেতখেতু, চ্যারকেটু, একজন জোতদার, কিছু রাজনৈতিক লোকজন। কিন্তু উপন্যাসটির মূল সাবজেক্ট খিদে। এবং সেই খিদেকে একজন নিম্নবর্গের মানুষ, যে হয়ত গত সাত দিন ধরে অভুক্ত হয়ে আছে, সে কীভাবে মোকাবেলা করছে, তা নিয়ে। উপন্যাসটার পাঁচটা পরিচ্ছেদ। পাঁচটা পরিচ্ছেদে খিদেকে পাঁচ রকম ভাবে দেখানো হয়েছে। দায়বদ্ধতার ভাষা এর আগে থেকেই আমরা দেখে আসছি। কিন্তু সেই দায়বদ্ধতার ভাষা, যেন অনেকটা ওপর থেকে দেখা ছিল। সে সুভাষ হোক, সুকান্ত হোক, পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যে সাহিত্য এসেছে, সাবিত্রী রায়ের ‘পাকা ধানের গান’ বা সুলেখা সান্যাল অথবা বরেন বসু। কিন্তু দেবেশ রায় টেবিলের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন। যে মানুষের খিদে, সেই মানুষের ভিতরে ঢুকে তিনি খিদেকে দেখতে চাইলেন।

উপন্যাসটা শুরু হচ্ছে একটি ভোর দিয়ে, শেষ রাত, হিমের ভারে গোয়ালের চালের যে খড় সেই খড়গুলো নিচে নেমে যাচ্ছে। আর চ্যারকেটু ঘুমোচ্ছিলো। এবার তার হিসি পেয়েছে। তাকে হিসি করতে যেতে হবে বাইরে। সে গত বেশ কিছু রাত খায়নি। শুধু খায়নি সেটাই তার একমাত্র সংকট নয়। তার আর একটা বড় সংকট হল হিমের ঠান্ডা হওয়া তার ফাঁক ফোকরওয়ালা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে, এবং তাকে রাত্রিবেলায় ঘুমোতে দিচ্ছে না। সেজন্য সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাবেশে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে পাওয়া যে বড় বড় ব্যানার, বড় বড় ফেস্টুন, সেই ফেস্টুনগুলোকে টেনে আনছে এবং সেগুলো দিয়ে ঘরের ফুটোগুলোকে মেরামত করছে। সেই হিসেবে তার কাছে চলে আসছে জোড়া বলদের ফেস্টুন, কাস্তে ধানের শীষের ফেস্টুন, কাস্তে হাতুড়ির ফেস্টুন, সিপিআই সিপিএম, বিভিন্ন

দলের ফেস্টুন। সর্বধর্ম সমন্বয় যেন। এরকম অবস্থায় সে যাচ্ছে হিসি করতে রাত্রিবেলা। এখান থেকে উপন্যাসের শুরু হচ্ছে। উপন্যাসের মাঝখানে গিয়ে এই চ্যারকেটুর যে কাকা খেতখেতু, সে শোনে যে সে তার জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তখন বলে, ‘মুই তো অধবা বিধবা-র থেকেও অধম’। মানে সে আগামী বহুদিন কী খাবে তার কোনও খোঁজ নেই। এদিকে তার পেটে একটা আলসার আছে যেটাকে শহরের ডাক্তার বলেছিল আলসারিয়া এবং সেই আলসার চেপে ধরে সে একসময় ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। সেই ক্ষেতের দুপাশে বড় বড় ধান গাছ। এদিকে খেতখেতু নিজে অভুক্ত। তার পেটে ক্রমাগত পাক দিয়ে জল উঠে আসতে থাকে। সে বুঝতে পারে না এটা আলসারিয়ার হেতু ব্যথা থেকে উঠে আসা রক্ত গোলা টক-জল, নাকি এটা খিদের জন্য ব্যথা। এবং সে পেট ধরে হাঁটতে থাকে, তার মনে হয় গ্রাম্য অপদেবতা ভোলামাসান, যে নিশুতি রাতে পথিকের পিছন পিছন হাটে, এবং পথিক পিছন ফিরতেই তার ঘাড় মটকে তাকে মেরে ফেলে, সেই ভোলামাসান যেন তার পিছু নিয়েছে। খিদের চোটে তার তখন হ্যালুসিনেশন হচ্ছে এবং সে তখন বিড়বিড় করতে শুরু করে দোহাই বাবা আমার পিছু নিও না। একদিকে এই, আর একদিকে বিভিন্ন দলের সমাবেশ ছিল, তার মধ্যে সিপিআই(এম) কংগ্রেস ইত্যাদি ছিল, সেই সমাবেশের মধ্যে একটি বলদ নিয়ে চ্যারকেটু ঢুকে পড়ে মূর্তিমান অ্যানার্কি হয়ে। রাজনৈতিক দলের নেতারা, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকতার পাঠ নিয়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না চ্যারকেটুকে কীভাবে সামলাবেন। সেই দুরন্ত বলদ এবং তার সওয়ার চ্যারকেটু সব লন্ডভন্ড করে দেয় যার কোনো দখল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিকতা নিতে পারে না। উপন্যাস শেষ হচ্ছে এইভাবে—‘ধান কাটতে এখনো দেরী আছে, এ আল ও আল ধরে ধরে পাকা ধান ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে পেঁচাতে

পেঁচাতে ক্লান্ত নিশ্চিত পায়ে চ্যারকেটু এখন দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে চলে যেতে থাকে'। দীর্ঘতর ক্ষুধা। এই যে দায়বদ্ধতার ভাষা বলছি যাকে, তাকে এবার প্রত্যক্ষ করুন—চ্যারকেটু ক্লান্ত নিশ্চিত পায়ে দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে চলে যেতে থাকে। কেন নিশ্চিত সে? আমি যদি বুঝি আমাকে সামনের বহুদিন অভুক্ত থাকতে হবে আমি তো তাহলে অনিশ্চিত থাকব। কিন্তু চ্যারকেটু নিশ্চিত, কারণ সে জানে এটাই তার ভবিতব্য। এই খিদের মধ্যে দিয়েই তাকে হাঁটতে হবে। সেই জন্য জীবনের অন্য কোনো ব্যাপারে নিশ্চয়তা না থাকলেও সে এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত যে তাকে আরো বহুদিন এই 'দীর্ঘতর খিদের' ভিতর দিয়ে যাত্রা করতে হবে। যতই তার দুপাশে উঁচু উঁচু সবুজ ধানগাছ পাখা মেলে থাকুক না কেন!

এই দায়বদ্ধতা, এ শুধুমাত্র একা দেবেশ রায়কে পড়ে বুঝলে হবে না, এই সময়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অসীম রায় হোন তাঁরা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোন, কিছুটা আগে ননী ভৌমিক হোন, মিহির আচার্য হোন, তাঁদের সবাইকে না পড়লে, সেই সামগ্রিকতা না বুঝলে, সেই বিশাল পরিবৃত্ত, যাকে অশোক মিত্র বলতেন পার্টি পরিবৃত্ত, একসঙ্গে বাঁচা, একসঙ্গে হয়ে ওঠা, একটা কমিউনিটির একসঙ্গে যাপন, তাকে না-বুঝলে ধরা যাবে না। তা হতে পারে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিজয়গড় কলোনিতে, অথবা হতেই পারে উত্তরবঙ্গে। এই ভাষা দেবেশ রায়ের ছিল, এটা দীপেন্দ্রনাথের ছিল এবং অবশ্যই অসীম রায়ের ছিল। তেমনই সেই দায়বদ্ধতা থেকেই হয়তো কোথাও চলে এসেছিল স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাও। নাহলে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শোকমিছিল' লিখবেন কেন, যেখানে সমস্ত রাজনীতিই গিয়ে মিলছে হননের শেষ ঠিকানায়।

আরেকটা গল্পের উল্লেখ করব, যে গল্পটা আমি জানিনা কেন খুব বেশি পড়া হয়না এখনও পর্যন্ত। একটু পরের দিকে লেখা গল্প,

সম্ভবত ১৯৮৭ বা ১৯৮৮ সালে। গল্পটার নাম ‘স্বপ্ন-জাগরণের ব্রত’। আবারও সেই উত্তরবঙ্গের, নুনভাতখাওয়া বলে একটি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, গনেশ বর্মণের গল্প। গণেশ বর্মণ সেই এলাকার কৃষক নেতা ছিলেন। পার্টির পুরনো দিনের কমরেড। জোতদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন পার্টি ক্ষমতায় আসে সেই অঞ্চলে পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। গণেশ বর্মণ যে উপজাতির মধ্যে থেকে এসেছেন, সেই গ্রামের, সেই উপজাতির, সেই গোষ্ঠীর একটি প্রথা ছিল যে যখন কোনও নতুন সন্তান জন্মাবে তখন তার আগের রাত্রে বা সাধ ভক্ষণের আগের রাত্রে, যে কোনও সময় হতে পারে, মানে সাধভক্ষণ থেকে সন্তান প্রসবের আগের দিন যেকোনো একটা রাত্রিবেলা, সেই গ্রামের মানুষ স্বপ্ন দেখবেন। কী সেই স্বপ্ন? নতুন যে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে, তার স্বপ্ন। এটা ছিল সংস্কার। তো সেই গণেশ বর্মণ, তিনি কোনওদিন বিয়ে থা করেন নি, সারাজীবন পার্টিকেই দিয়ে গেছেন। তাঁর দাদার মেয়ে অর্থাৎ ভাইঝি, আসন্নপ্রসবা ছিল, তার সাধভক্ষণ হয়েছিল। কিন্তু গণেশ বর্মন সকালবেলায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন। তিনি সারা রাতেও কোন স্বপ্ন দেখতে পারেননি। সারা রাত কেটে গেছে, তিনি স্বপ্ন দেখার বার বার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনও স্বপ্ন আসেনি। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এবং আস্তে আস্তে দেখা গেল একজন দুজন করে সারা গ্রাম গণেশ বর্মণের সঙ্গে কাঁদছে। কারণ এ হলো এক কান্নার যৌথতা। যেহেতু গণেশ বর্মণ স্বপ্ন দেখতে পারে নি সেহেতু এবং সেই গ্রামের কেউই যেহেতু স্বপ্ন দেখতে পারেনি তার মানে সেই গ্রাম আস্তে আস্তে স্বপ্নহীন হয়ে যাচ্ছে। এবং গণেশ বর্মণ যখন কাঁদছেন, সারা গ্রাম কাঁদছে, তখন দেবেশ রায় লিখছেন—‘এমন শক্তিমান যদি স্বপ্নহীন হয়ে যায় তাহলে তো সমস্ত স্বপ্নহীনরা শক্তিমান হয়ে উঠবে। সে দুর্দৈব ঠেকাও’। যেন একটা অশনিসংকেত দিয়ে

যাচ্ছেন দেবেশ রায় এবং মনে রাখতে হবে এটা ১৯৮৮ সালের লেখা গল্প। যখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসে গেছে, পার্টি মোটামুটি এই ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছে যে তাকে আর কেন্দ্রের সরকার ফেলে দেবে না, এবং আস্তে আস্তে সে গেড়ে বসেছে। সালকিয়া প্লেনামের পরবর্তী পর্যায়ে পার্টি প্রবেশ করছে, গ্রামেগঞ্জে, রান্নাঘরে, মানুষের অতিথিশালায়, ঠিক তখনই দেবেশ রায় এই চেতাবনি উচ্চারণ করছেন যে তাহলে একদিন সব স্বপ্নহীনেরা শক্তিমান হয়ে উঠবে। কখন? যখন একটা কান্নার যৌথতা ঘটছে। একটা গ্রামের সমবেত সবাই মিলে কাঁদছে। কারণ তারা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। তাহলে কমিউনিস্ট পার্টিই কি স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে?

গল্পটা লেখার সময়, মানে এবং ১৯৮৮, এই সালটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। সে সময়ে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা হচ্ছে। গর্বাচভ চলে এসেছেন এবং আস্তে আস্তে কোথাও গিয়ে একজন কমিটেড শিল্পী, তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে যে তাহলে সোভিয়েত কি আসলেই ঠিক? পূর্ব ইউরোপের একটার পর একটা ঘটনা সামনে আসছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে দেবেশ রায়ের মনে হচ্ছে তাহলে কি স্বপ্নহীনেরাই শক্তিমান হয়ে উঠছে?

আমি কয়েকটা গল্পের উল্লেখ করলাম। এরকম আরও গল্প আছে। মানে আমি যদি সেগুলোকে সেই রাজনীতির সঙ্গে, অর্থাৎ সেই কমিটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি তাহলে দেখবো সেটাও গিয়ে সেই সামগ্রিক পরিবৃত্ত অর্থাৎ পার্টি পরিবৃত্তকেই আখ্যায়িত করছে। দেবেশ রায়ের কাছে আমৃত্যু তাঁর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তাই দেবেশ রায়কে বুঝতে গেলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বুঝতে হবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি মানে শুধু পার্টি হিসেবে বুঝলেই হবে না। পার্টি একটা অস্তিত্ব, একটা সামগ্রিক যাপন। দেবেশ রায় সেভাবেই দেখতেন। এবং এইখানে

কে কোন দলীয় রাজনীতি করছেন সেটায় কিছু আসছে যাচ্ছে না। একটা গল্প লিখেছিলেন ১৯৭৪ সালে, তখন নকশাল আন্দোলন শেষ হচ্ছে, গল্পটার নাম ছিল ‘কয়েদখানা’। একটা দীর্ঘ গল্প। একটা জেল ভাঙার পরিকল্পনা হবে এবং সেটা ব্যর্থ হবে। গল্পের যে প্রোটাগনিস্ট, সে কিন্তু সেই জেল ভাঙার পরিকল্পনাটা করেনি। এবং গোটা গল্পটা জুড়ে সে বারবার বলতে থাকে, ‘এই অ্যাকশান আমার না এই এস্কেপ আমার না’। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য নিয়তির ফেরে নশুকে, অর্থাৎ গল্পের প্রোটাগনিস্টকেও ওই অ্যাকশনের ভিতরে ঢুকে যেতে হয়। তবুও সে বলতে থাকে ‘এই অ্যাকশন আমার না এই এস্কেপ আমার না’। তারপরে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলি বিনিময় হয়। দু’পক্ষেই কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয় এবং নশুদের প্রচণ্ড মারতে মারতে আবার কয়েদের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নশুকে যখন কয়েদের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন সে দেখতে পায় তার সামনে, মানে গরাদের উল্টো পারে একটি দেহ পড়ে আছে। তারই কোনও এক সহযোদ্ধার দেহ। সেও হয়তো এস্কেপ করতে চেয়েছিল। সেও এই অ্যাকশনে অংশ নিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি এবং তাকে পুলিশ এখানে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। সে জীবিতও হতে পারে মৃতও হতে পারে। নশু বুঝতে পারে যে তার খুব হিসি পেয়েছে। এবং গরাদের ফাঁক দিয়ে পেচ্ছাপ করার জন্য তৈরি হতে হতেই তার কাছে স্পষ্ট হয় এই জন্য, শুধু এজন্যই—‘একে আমার সামনে রেখে দিয়ে যাওয়া হলো যাতে এই সেক্লুশন সেলের নিঃসঙ্গতায়, আমার কফ থুতু বা পেচ্ছাপ দিয়ে আমি আমার মৃত বা মৃতপ্রায় সহযোদ্ধাকে, অপমান করতে পারি, অপমান করে যাই। জয় হতে পারে, ভোম্বল, টুবলা, বিমলবাবু বা আকবর হতে পারে, আমি নিজেও হতে পারি, আমার নিজের শবদেহের উপর আমাকে

পেচ্ছাপ করানো হচ্ছে। তখন হাতে পায়ে বেড়ি নিয়ে হাতকড়া বাঁধা দুই হাত মাথার উপর টান টান তুলে, নশু দুইহাটের মুঠোয় একটা শিক চেপে ধরে, ডান বাহুর পেশীর উপর মুখটা চেপে ধরে শরীরের সমস্ত পেশী সঙ্কোচনের চেষ্টা করে এবং বলে—না।'

কিন্তু এখানেই গল্পটা শেষ নয়। এখানেই যদি গল্পটা শেষ হতো তাহলে মনে হতেই পারত যে দেবেশ রায় বোধহয় সেই ইউটোপিয়াতেই আটকে পড়ে আছেন। গল্পটা তারপরেও দুটো লাইন চলেছিল। 'তারপরে শরীরের নিয়মেই একসময় নশুর শরীর ভিজিয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে পেচ্ছাপ হয়ে যেতে থাকে। আর জলের নিয়মে সেই জল গরাদের ফাঁক দিয়ে সেই জীবিত বা মৃতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।'

দেবেশ রায়কে ওই ইউটোপিয়ার মধ্যে বাঁধা যায় না যেহেতু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে দায়বদ্ধ। দেবেশ রায় জানেন কোনও ইউটোপিয়া দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিকে ধরা যায় না। যেহেতু তিনি দায়বদ্ধতার ভাষা লিখছেন, তাই ইউটোপিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, তাই তাঁর গল্পের প্রোটাগনিস্ট যার অ্যাকশন ছিল না, যার এস্কেপ ছিলনা, কোনকিছুই যার দখলে ছিল না - সে শুধু না বলে থেমে যেতে পারে না, না বলার পরেও সে হিসি করে ফেলে এবং হিসি তার সহযোদ্ধার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবারো ফিরে যেতে হয় দীপেন্দ্রনাথের কাছেই, তাঁর সম্পাদিত একটা বই ছিল—লেনিন শতাব্দী, সেই সংগ্রহের ভূমিকায় লিখেছিলেন—আগামী শতাব্দীর মানুষ গ্রহান্তরে লেনিন জয়ন্তী পালন করবে। দুঃখের বিষয় ছিল বা সেটাই ট্রাজেডি যে সেই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই, দীপেন্দ্রনাথ হয়ত দেখে যেতে পারেননি, লেনিন তাঁর মসোলিয়ামে রাখা

শবদেহের মতই অবান্তর হয়ে গেলেন। বামপন্থী বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন—এই ‘অবান্তর’ কথাটি ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু হয়তো দীপেন্দ্রনাথ বা দেবেশের কাছেও এটাই মনে হতো—তাঁদের অস্তিত্বের বুনিয়াদটাই খসে গেল। বিশ্বাস বদল করে তো মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষ বিশ্বাস বদল করে বাঁচেওনা। এবং তৃতীয় বিশ্বের একটা বড় দেশে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের মধ্যে, মানুষের ওপর, মানুষের সমাবেশের ওপর, মানুষের চৈতন্যের বিদ্রোহের উপর এই সামগ্রিক যাপন, যাকে আমি কমিউনিস্ট পার্টি বলে বারবার বলছি, সেই পার্টির উপর, মানবসত্তার জাগরণের উপর নির্ভরতা ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া দেবেশ রায়ের মতো লেখকের যে আর কিছু নেই, সেটা দেবেশ রায় নিজেই স্বীকার করে গেছেন, তাঁর পাঁচ খণ্ডের গল্পসমগ্রের পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায়। তিনি লিখে গেছেন যে ‘এটাও কেবল আশাই যে, আশা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না। যতটুকু জীবৎকালই অবশিষ্ট থাকুক না কেন এই আশাটুকু ছাড়া সেটুকুও পাড়ি দেওয়া যাবে না। সেই অবলম্বনই লেখায় এবং বাঁচায়। সেই অবলম্বনটুকু নিয়েই আমি লিখব এবং বাঁচবো।’

তাই দেবেশ রায় কে বুঝতে গেলে তাঁর অবলম্বনটুকু বুঝতে হবে, তাঁর কমিটমেন্টটুকুও। এটাও বুঝতে হবে আমাদের গত শতাব্দীর যে বিরাট সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি সেটা কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির যৌথতা, তার সামগ্রিক অস্তিত্ব ছাড়া সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না দেবেশ রায়ের লেখালেখিও। অথবা সম্ভব হতো না দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অসীম রায়দের লেখালেখিও। বারবার দেবেশ রায়ের প্রসঙ্গে এই দুজনের বা অন্যদেরও, ননও ভৌমিক বা মিহির আচার্য, এঁদের নাম এসে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা

বিষয়ের কারণেই আনতে হল। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি একটা যৌথতার নাম, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উজ্জ্বলতম অংশবিশেষের নাম, সেহেতু দেবেশ রায়কে বুঝতে গেলেও সেই যৌথতার মাধ্যমেই বুঝতে হবে।

বঙ্গীয় শব্দকোষে বৃত্তান্তের অর্থ নির্ণয়ও বটে

তাপস দাশ

দেবেশের মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা নিয়ে যে আলোচনা বেশি হল না, হচ্ছে না, সেটা খুব বিস্ময়কর নয়। বিস্ময়কর নয় এই কারণে যে, দেবেশ রায়ের লেখার যা ব্যাপ্তি, তাঁর লেখার যা পরিধি, তাঁর ভাষাচর্চা, তাঁর বিষয়, এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই—এই গোটা ব্যাপারটাকে ধরে উঠতে পারা, তাঁকে ছুঁয়ে ফেলতে পারা, বা ততটাও যদি না হয়, একটি পাহাড় যে মুগ্ধতাযোগ্য তা বুঝতে পারা, সেই মুগ্ধতাকে অন্তরে বোধ করতে পারা ও সেই বোধকে লিপিবদ্ধ করতে পারা—এমন লেখক সমালোচক, দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল। যে কারণে দেবেশ রায় নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, এবং যেটুকু দেবেশ রায় স্মরণ সংখ্যা-টংখ্যাও বেরিয়েছে তাঁর প্রিয় পরিচয় পত্রিকাসহ, তার প্রায় সবটাই জুড়ে থেকেছে দেবেশ রায়ের স্মৃতিচারণা। দেবেশ রায়ের গল্প, দেবেশ রায়ের উপন্যাস, দেবেশ রায়ের গদ্য ধরে তাঁকে আতশ কাঁচের তলায় ফেলা, সেই আতশ কাঁচের নিচ থেকে কোনও অক্ষর, কোনও শব্দ, কোনও বাক্য, কোনও অনুচ্ছেদ, কোনও পরিচ্ছেদকে তুলে আনতে পারা তেমন চোখে পড়েনি।

এই যে চোখে পড়ল না, এটা দেবেশ রায়ের প্রাপ্তি। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল যে দেবেশকে নিয়ে আলোচনার ক্ষমতা,

তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। দেবেশ রায়ের উপন্যাস আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তি আমার কাছে ও পাঠক আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, নানাবিধ কারণে। তার একটা কারণ অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিকতা এবং তাঁর ভাষা। তাঁর ভাষা আক্ষরিক অর্থেই বিষয়ের চাপে নির্মিত হয়। ফর্ম আর কন্টেন্টের ওই পুরনো দ্বন্দ্ব ওখানে বোঝা যায় না। মানে ওই দ্বন্দ্ব যে প্রত্যাখ্যাত, এবং তা যে অসত্য, সে কথা দেবেশের লেখাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পড়া হলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। যদি আমরা দুটো চরিত্র দেখি— তিস্তাপারের বৃত্তান্তের বাঘারু আর সময় অসময়ের বৃত্তান্তের কেলু, এই দুটো বাংলা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ অন্যতম সেরা প্রলেতারিয়েত চরিত্র। প্রলেতারিয়েতের বাংলা সর্বহারা করা হবে কিনা, করা উচিত কিনা সেটা নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। আমি সর্বহারার পক্ষে। সর্বহারা মানে সর্বস্বহারা নয়, তার স্ব টুকু রয়েছে। সেই স্ব-টুকু কিরকম স্ব? সেই স্ব টুকু ভদ্রলোকের নির্মিত স্ব-এর বাইরের একটা স্ব। সেই স্ব-টুকু সহই সে সর্বহারা। কিন্তু এই সর্বহারার একটা অন্যতর দিক আছে। এই সর্বহারা কোথাও একটা অ্যালিয়েনেটেডও বটে, বহির্বিশ্বের বাস্তবতা থেকে অ্যালিয়েনেটেড; তার নিজস্ব নির্মিত বাস্তবতায় সে প্রোথিত এবং গ্রন্থিত। যদি আমরা বাঘারুকে দেখি, বাঘারুকে বাইরের থেকে দেখলে ঠিক আমাদের মত মানুষ মনে হয় না, আমাদের মত মানুষ সে নয়। সে যখন গাভীর দুধ দোহায়, সে তার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করে, সে যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শুয়ে থাকে, তার শরীরের কাছে পাখি আসে নির্ভয়ে। বাঘারুর ডাকে, বাঘারুর শরীরের ভাষ্যে এমন কিছু আছে যা পশুপাখিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচনা করতে পারে। বা মিছিলের কথা, যে মিছিলে সবাইকে পেটানো হচ্ছে, কিন্তু বাঘারু একটা দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েও পুলিশের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ সে ততটাই ফরেস্টের অংশ। পুলিশ মানুষের

কাছ থেকে সে অ্যালিয়েনেটেড, আর তার সম্পর্ক ফরেস্টের সঙ্গে। যদি সময়-অসময়ের কেলুকে দেখেন, কেলু কখনও স্টোনম্যান হয়ে উঠতে চাইছে, কখনও সে বেহালার তেলরোগী হয়ে উঠতে চাইছে এবং তা হয়ে ওঠার জন্যে, তেলরোগী হয়ে ওঠার জন্যে সে নিজেই নিজেকে পঙ্গু বলে ভাবতে থাকছে। 'ভাবতে থাকে' কথাটা বলা স্পর্ধিত হয়ে যাবে পাঠকের পক্ষে, 'ভাবতে থাকে' কথাটা ঠিক হবে না। কেলু নিজের শরীরের মধ্যে পঙ্গুত্ব রচনা করে নেয়, কেলুর ভাবনাটা আমরা জানি না। কেলুর ভাবনাটা ঠিক কী, অন্তত এইরকম ক্ষেত্রে সেটা আমরা কেউ জানিনা। আমরা জানি কেলু ছেঁচড়ে ছেঁচড়েই হাঁটে হাসপাতালের মধ্যে। কেলু লাঠির উপর দুই হাতে ভর করে, শরীরের ওজন দুহাতের উপর দিয়ে, থপথপ করতে করতে বাথরুমে যায়। কেননা কেলু তেলরোগী হয়ে উঠছে। এমন একটা কথা মনে হতে পারে যে, একটু আগে যেটা বললাম, 'স্ব'। 'স্ব' যদি থেকেই থাকে, তাহলে সে কী করে এমনটা হয়ে উঠতে পারে, একটা পাত্রের জলের মত। কিন্তু তা ঠিক এমন ছক বেঁধে ঘটে ওঠে না। কোনও একটা সময়ে কেলু এখান থেকে বেরিয়ে যায় তার 'স্ব'-এর ডাকে। এবং তেমনই এক 'স্ব'-এর ডাকে সে গঙ্গাসাগর পৌঁছয়। কোনও এক সাধুর সঙ্গে মিলে গিয়ে সে নিজের পিণ্ড দান ক'রে সমুদ্রের প্রায় মাঝখানে চলে যেতে চায়। এই যে এমনতর ঘটনাবলির উল্লেখ আমি করে চলেছি উদাহরণ হিসেবে, এমন মনে হওয়ার অবকাশ রয়েছে, যে এগুলি সবটাই একটু ভাববাদী ব্যাপার। যে রাজনৈতিকতার সঙ্গে দেবেশ রায়ের আমৃত্যু বাস, সেই রাজনীতির সঙ্গে তো ভাববাদ সংগতিপূর্ণ নয়। এবং মুশকিল হল, আমরা, দেবেশ রায়ের যে রাজনৈতিকতা, দেবেশ রায়ের যে রাজনৈতিকতায় আস্থা, হয়ত বিশ্বাস শব্দটা বললে ঠিক হত, কিন্তু থাক - আস্থা - সেই আস্থার সঙ্গে ভাববাদের একটা খুব ভাব ভালবাসা

নেই, অন্তত আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধি অনুযায়ী। দেবেশ বারবার একটা কথা বলতেন, অনেকবারই বলেছেন অনেক আলোচনাতে, ঔপন্যাসিক বাস্তবতা। ঔপন্যাসিক বাস্তবতা বাংলা ভাষায় যারা সফল ভাবে রচনা করতে পেরেছেন দেবেশ রায় তাঁদের অন্যতম। সেই ঔপন্যাসিক বাস্তবতার সঙ্গে রিয়েলিজমের যোগাযোগ নেই। ম্যাজিক রিয়েলিজমেরও কোনও যোগাযোগ নেই দেবেশ রায়ের লেখার সঙ্গে, তা ব'লে রিয়েলিজমেরও নেই। যে রিয়েলিজমের চর্চা, এক ধরণের কমিটেড শিল্প সাহিত্যে করা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে দেবেশ রায়ের সম্পর্ক নেই, দেবেশ রায়ের শিল্পের, দেবেশ রায়ের সাহিত্যের। এই যে কেলু, বাঘারু—এদের সঙ্গে একটা—এটা অতিবাস্তবতা বলা ঠিক হবে না, পরাবাস্তব নয়, যাদুবাস্তব নয়, কিন্তু একটা অন্য বাস্তবতা। দেবেশের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতাকে কী নাম দেওয়া হবে আমি জানি না—সেই বাস্তবতার সঙ্গে এই কেলু এবং বাঘারুদের যে বাস্তবতা, সেটা চর্চিত বাস্তববাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, বোধহয় বিপ্রতীপেও।

একটু বাচালতাই হবে বোধহয় যদি বলা হয় যে দেবেশ রায় সম্ভবত প্রত্যাখ্যানের ভাষাকার। ঠিক কেন এটা মনে হচ্ছে একটু বলার চেষ্টা করি। এর একটা, একটু পূর্ব ইতিহাস আছে, ব্যক্তিগত ইতিহাস। বেশ কয়েক বছর আগে কঙ্ক পত্রিকায় একটা দেবেশ রায়ের সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আমাকে তাতে লেখার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন সম্পাদক স্বপন পাণ্ডা। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমার লেখার বিষয় হবে দেবেশ রায়ের কেন নোবেল পাওয়া উচিত নয়। দেবেশ রায়ের নোবেল পাওয়া উচিত নয় বলে আমি এখনও মনে করি। তার অন্যতম কারণ, নোবেল মূলত ইউরোপিয় ক্লায়েন্টেলের ব্যাপার। ইউরোপের মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে সক্ষম লেখাই নোবেলযোগ্য। দেবেশ রায় এমন একটা ভাষার, এমন একটা

বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, সচেতন ভাবে চর্চা করেছেন, যে ভাষা ইংরিজিতে অনুবাদযোগ্য নয়; এটা যে তিনি সচেতন ভাবে হতে চেয়েছেন, সে কথা আমরা একটু খুঁটিয়ে যদি দেবেশ রায়ের বিভিন্ন প্রবন্ধ বা বইপত্র পড়ি তাহলে দেখা যাবে।

দেবেশ রায় সেন্টারে একটা গবেষণা করেছিলেন, যেটা পরে বই হয়ে বেরোয়—'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য'। তার ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন "যে গদ্যের প্রকাশক্ষমতা বারবার তার শক্তিসংগ্রহ করে কর্মে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে, যে কৃষকদের মধ্যে ভাষার বাচন সংরক্ষিত হয়ে থাকে, তাঁদের নিয়ত সহযোগে ও একই কারণে মেয়েদের বাগভঙ্গির অনুকরণে। জন্মক্ষণ থেকে বাংলা গদ্য এই তিনটি উৎস থেকেই বঞ্চিত। পরাধীন একটি দেশে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই প্রাথমিক প্রয়োজনে এক হঠাৎ তৈরি রাজস্থানি মহানগরে বাঙালিকে তার গদ্য ভাষা আবিষ্কার করতে হয়েছিল, আর তারপর সেই ভাষাকে আশ্রয় করে, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে, এক পরিণত গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল।" ওই বইয়েরই আরেক জায়গায় তিনি লিখছেন, ওই ভূমিকাতেই, "শাহেবদের গদ্যচর্চার প্রথম স্তরে বাংলা গদ্যের বিষয়ের পরিধিতে যা আসছে তা বাঙালির অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় নয়, বাঙালির জীবনের সত্য নয়। একটি ভাষা তৈরি হচ্ছে, যার প্রাথমিক ব্যবহার ঘটেছে অনুবাদে, ভাষার অনুবাদ নয়, বর্তমান অভিজ্ঞতার অনুবাদ, ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুবাদ, আর দুইয়ের মিশ্রণে চৈতন্যের অনুবাদ। তখনকার বাঙালির দৈনন্দিনের বাইরে এই ভাষা যেন হয়ে উঠতে চাইছে তখনকার ইতিহাসের ব্যাখ্যা। বাংলা গদ্য জন্মক্ষণেই এই জীবনবিচ্ছিন্নতার বীজাণুতে আক্রান্ত হয়ে গেল, আর সেই শূন্যতা জুড়ে থাকল ব্যাখ্যার ফাঁকা প্রবণতা, ঔচিত্যের ফাঁপা শাসন, উপদেশ বা আত্মবিলাপের ছন্দহীন উচ্চাবচতা।" দেবেশ লিখছেন, "ইংরিজি বাক্যগঠন পদ্ধতির সন্নিহিত বাক্যগঠন করতে হবে,

শাহেবরা যাতে বাক্যের অর্থ বুঝতে পারেন। আবার সে ধরণ সংস্কৃত বাক্যগঠনের পদ্ধতির সন্নিহিতও হতে হবে যাতে পণ্ডিতেরা সেই ধরণে লিখতে পারেন। অর্থাৎ ভাষার নিজস্ব প্রবণতা কথ্য ভাষায় বা গদ্যের লিখিত রূপের কোনও অস্পষ্ট পূর্ব আভাস বাংলা গদ্যের আদর্শ হয়ে উঠল না, বাঙালিকে তার নিজের ভাষা সাহেবদের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছিল।" ফলে যেটা হচ্ছে, দেবেশ জেনে গিয়েছেন, জেনে যাচ্ছেন যে এই ভাষাটা, যে ভাষায় তিনি লিখছেন, সেই ভাষার শুরুটা কিরকম—তা বীজাণু আক্রান্ত। বীজাণুই লিখেছেন দেবেশ। এই সংক্রমণ থেকে তিনি মুক্তিও পেতে চান, কিন্তু আবার তাঁকে সেই ভাষাতে লিখতেও হয়। ফলে তিনি তাঁর ভাষাকে এমন করে তুলতে থাকলেন, এমন করে তুলতে চাইলেন, তাঁর প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গিতে, তাঁর বাগধারায়, যে তা যেন কিছুতেই ইংরিজিতে অনুবাদযোগ্য না হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাখ্যান, এই প্রত্যাখ্যানের ভাষা তাঁর প্রায় শুরু থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। আমাকে একজন, খুব বিখ্যাত লেখক তথা সমাজকর্মী বলেছিলেন যে 'মানুষ খুন করে কেন' প'ড়ে তাঁর ওই কথাটাই মনে হয়েছিল, যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ খুন করে কেন। এটি তাঁর সমালোচনার ধরন দেবেশ সম্পর্কে, দেবেশের লেখা সম্পর্কে। কিন্তু মূলত ব্যাপারটা এই যে, দেবেশ—এ তো পড়াই যায় না, ঢোকা যায় না এর মধ্যে। এই গল্পটাও চালু রয়েছে, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বইটা হাতে নিয়ে শান্তিনিকেতনের একজন অধ্যাপক দেখে, নাড়াচাড়া করে "না, এ তো ঢোকাই যায় না" বলেছিলেন। দেবেশ সচেতন লেখক হিসেবে এমন ভাষার চর্চা করেছেন যে ভাষায় সহজে ঢোকা যায়না। ঢোকা যাবে না—এমন একটা ভাষাই তিনি রচনা করতে চেয়েছেন, যে ভাষার সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচিতি, যে সহজ সরল দৈনন্দিনের ভাষা তেমন নয়। এই সহজ সরল নিয়ে দেবেশেরই একটা কথা আছে 'জলের মিনার জাগাও' বইতে—"সহজবোধ্য করে বলা, সাধারণ পাঠ্য করে বলা, কঠিন করে

না-বলা—এইসব হস্তলিপিশিক্ষার নীতি দিয়ে কি শিল্প হয়?”

দেবেশ জানতেন ওভাবে শিল্প হয় না বা দেবেশ অন্তত যে শিল্প চর্চার কথা কল্পনা করেন, যে শিল্পচর্চা প্র্যাকটিস করেন, তা ওই সারল্যের হস্তলিপিশিক্ষার লজিক দিয়ে হয়ে ওঠে না। ফলে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষা রচনা করছিলেন, যাকে, সম্ভবত আমরা প্রত্যাখ্যানের ভাষা বলতে পারি। এই অর্থে, যে তা সরল বাংলা হস্তলিপিশিক্ষার যেসব পুস্তক বাজারে বিক্রি হয় এবং সহজলভ্য, তা তিনি রচনা করতে চান নি, এবং দ্বিতীয়ত, যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে ভাষা সাহেবদের কাছ থেকেই শেখা এবং সাহেবদের প্রয়োজনীয়তার জন্যে তৈরি হওয়া, সেই ভাষাতেই যখন লিখতে হবে, তখন সাহেবদের নিজস্ব ভাষায় কিছুতেই অনুবাদযোগ্য না-করে তোলাই তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর ইতিহাসে যারা তত্ত্বচর্চা করেন আর যারা অনুশীলন করেন—এ দু পক্ষই, সাধারণভাবে দেখা যায়, পরস্পরকে আড়চোখে দেখেন। বাংলা সাহিত্যের তেমন কোনও তত্ত্ববিশ্ব তৈরি হয়ে ওঠেনি; অন্তত সচেতন তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায়না বললেই চলে। এই অভাবটা দেবেশ রায় অত্যন্ত কঠোর ভাবে অনুভব করেছিলেন, এবং সেই অনুভবের সাপেক্ষে তিনি, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে, একটা তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ করতে চাইছিলেন। দেবেশ রায় কে? দেবেশ রায়কে আমরা একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে, একজন গল্পকার হিসেবেই মূলত চিনে থাকি। এই তত্ত্বের প্রতি, এই সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি, বাংলা সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি দেবেশ রায়ের যে আগ্রহ জন্মায় তা ওই সংকট থেকে, যে সংকট থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, বাংলা সাহিত্যের তত্ত্ব নেই । ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ বইতে দেবেশ লিখছেন “উপন্যাস কাকে বলে এটাও আমাদের শিখিয়েছেন

ইউরোপীয়রাই, তাঁদের অ্যাংলো স্যাকসন চেহারায়, যদিও ইউরোপ মহাদেশে অ্যাংলো স্যাকসন উপন্যাসের ঐতিহ্য তেমন উঁচু মাপের নয়, কিন্তু আমরা স্কটের কাছ থেকেই যখন উপন্যাস শিখছি, তখন আমাদের হাইল্যান্ড ও ব্যারন না থাকলেও, উপন্যাসে হাইল্যান্ড ও ব্যারন আমাদের তৈরি করে নিতে হল। ১৮৬৫ তে আমরা উপন্যাস লিখতে ও পড়তে শিখি। কলোনির শিক্ষিত প্রজার এই শিক্ষার ভিতরে কী নির্মম কৌতুক নিহিত ছিল! মাত্র তার বছর তিরিশ আগে সমগ্র বাঙালি ভারতীয় সমাজ অসম দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা চালু থাকবে কিনা—এরকম একটি প্রশ্নে। কোম্পানির সরকার যে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে একটা আইন বানাতে পেরেছিলেন, সে তো মাত্র সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুর সমর্থনের জোরে। ১৮৬৫ তে মাত্র বছর দশেক আগে কোম্পানির সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থনে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসংগত ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। আর ১৮৬৫ তে প্রথম বাংলা উপন্যাসের নায়িকা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করে দিল, এই বন্দী আমাদের প্রাণেশ্বর। এ ঘোষণা মিথ্যা ঘোষণা, যেমন এ ঘোষণা এমনই মিথ্যা ছিল পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশে ও মহাদেশে। কিন্তু ঘোষণার বিষয়টা যত মিথ্যেই হোক, ঘোষণার ভাষা তো সত্য—সে ভাষায় এই মিথ্যা ঘোষণাকেও সত্যের মতই শোনাত। বাক আর অর্থের মধ্যে এক ঔপনিবেশিক শক্তি ঢুকে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন থেকেই আমাদের নিজেদের কাহিনিকার হওয়ার পরিচয় হারাতে শুরু করি, আমরা ধরে নিলাম ওই ভাষা আর ওই ঘোষণার নামই উপন্যাস। ওই ভাষা আর ওই ঘোষণার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে অর্থ গলে গেল। ইংরেজরা আমাদের এই উপন্যাস শিখিয়েছে, আমরা আমাদের নিজেদের কাহিনি হারিয়ে ফেলেছি। ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনে আমাদের একটা কাহিনির ধরন তো ছিল, এগুলোর ছক

ছিল বাঁধা ছক কিন্তু প্রত্যেকবার প্রত্যেক ব্রতকথা বা পাঁচালিকার বা কথকঠাকুর বা কীর্তনিয়ার বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনিগুলি অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। একই কাহিনি ভিন্ন কথকের গলায়ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি হয়ে যেত। একই বাঁধা ছকের কাহিনি এমনই অব্যর্থতায় কাহিনিকারের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে আরও একবার ঢালাই হয়ে যেত। যেমন ছৌ নাচের মুখোশের অপরিবর্তনীয়তা আরেক নিয়ত পরিবর্তমান ছাঁচের আকার পেত। গল্পগুলো এত চেনা, এত জানা, এত শোনা কিন্তু সেই গল্প আরেকবার না বললে ব্রতপালন সম্পূর্ণ হবে না, ব্রত ভাঙা যাবে না।”

কাহিনিকার হিসাবে দেবেশ রায় বারবার যে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, পরিবর্তিত সময়ে কীভাবে লেখার গড়ন, গঠন, আকার, প্রতিমা নির্মিত হবে সেই সংকট—সেই সংকট থেকে বেরনোর পথ তিনি নিজেই খুঁজে নিচ্ছেন এবং সেই খুঁজে নেওয়ার কথাটা লগবুকের মতন করে লিপিবদ্ধ করে রাখছেন । ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে তিনি ‘উপন্যাসের বিবিধ সংকট’ নামে আরেকটি বইতে লিখছেন—“কখনও কখনও এই সংকট থেকে বেরোবার পথ খুঁজে ভাবি শব্দ বা ভঙ্গি বা এমনকি বিস্ময় যত বেশি বিধিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অতিব্যবহারের অনড়তায় আটকে যাচ্ছে, গল্প ততই হয়ে উঠবে মুক্তিহীন, ততই গল্পের ভাষা হয়ে উঠবে স্বাধীন অনপেক্ষ। শরীর যতই দৃশ্য হয়ে উঠবে, গল্পের মানুষের শরীর হয়ে উঠবে ততই অচ্ছ। সে অচ্ছতার দৃশ্যমান হয়ে উঠবে তাদের শরীরের অভ্যন্তর, তাদের অস্থি-মজ্জা-মেদ-শিরা-উপশিরা-ধমনী-স্নায়ু আর তার দৃশ্যভাগের তিনগুণ তরল, ক্ষরণ ও রসায়ন। গল্পে এখন শুধুই চাই শরীরের ভিতরের অশরীর। আবার কখনও ঠিক এর উলটো একটা আভাস পাই—গল্পকে প্রাচীনতা আয়ত্ত করতে হবে ও নতুন প্রাচীনতা রচনা করতে হবে। সে প্রাচীনতার

জন্য পাহাড়ের ঘাম হাতে মেখে সমুদ্রের নুন চুলে ভরে, খাদানের কয়লার কালো গুঁড়ো ও হীরকের দ্যুতিচূর্ণ গায়ে মেখে স্পেসশিপের নিভৃতি মাটিতে নামিয়ে এমন বীরত্বের গল্প খুঁজতে হবে যা এখনও স্পন্সরড নয়, এমন প্রণয়ের গল্প খুঁজতে হবে যা নিরপেক্ষ, নিরুপাধি ভঙ্গি মাত্র নয়, বরং যা ক্রমেই সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে সমুদ্রস্রোতের মিশে যাওয়ার ভবিতব্য, এমন শোকের গল্প যে শোক নিয়ে বেঁচে থাকা নিজের ভারকে বসুমতী তুল্য করে তোলে ও নিজেকে সেই ভারবহনের বাসকীতুল্য, এমন মৃত্যুর গল্প যা জীবনের অধিক নয়, এমন জীবনের গল্প যা মৃত্যুর অধিক। এই পুরনো কথাগুলির ভিতর দিয়ে যে যেতে হল, তেমন যাওয়ায় আমার ভাবনার কোনও নিরসন হয়নি, পাঠকদেরও হবেনা। কথাগুলি পুরনো তাঁদের কাছে, যাঁদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী কী কর্তব্য তা সবসময়েই জানা থাকে। আমাদের পক্ষে তো এটা রোজকার বেঁচে থাকার কষ্ট, মরে যেতেও পারি না, কারণ মরে যাওয়া শেখাও প্র্যাকটিস করা যায়না । বেঁচে থাকতেও পারিনা, কারণ বেঁচে থাকা শিখতে হয়না ও প্র্যাকটিস করা যায় না।”

শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে প্রলেতারিয় চরিত্র এবং অ্যালিয়েনেশনের কথা, সে প্রসঙ্গে আরেকটা চরিত্রের কথা উল্লেখ্য, তিস্তাপুরাণ উপন্যাসের চরিত্র ছোটচিলা, ছোটচিলা যেভাবে গোত থেকে আলাদা হয়ে যায়, গোত... গোতের বোধ্য বাংলা গোত্র হতে পারে, আরেকটু কিছুও হতে পারে... সেই গোত থেকে যখন আলাদা হয়ে যায়, তখন যে ভাবে সে লাল পতাকাটাকে আশ্রয় করে নেয় বিচ্ছিন্নতার সময়কালে, গতির বিরুদ্ধতার সময়কালে, তাতে আরেক ভাবে হয়ত প্রলেতারিয় একটা চরিত্রাংশ তার মধ্যে গ্রন্থিত হয়—এটা অনুল্লেখ থাকা বাঞ্ছিত নয় বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত দেবেশ রায় একজন ঔপন্যাসিকই ছিলেন, একজন

প্রেততাড়িত ঔপন্যাসিক। বা উলটোদিক থেকে বললে দেবেশ রায় কে-ই বা ছিলেন একজন প্রেততাড়িত ঔপন্যাসিক ছাড়া? সে প্রেততাড়না তাঁর একটা উপন্যাসের অংশ উল্লেখ করলে হয়ত বোঝা যাবে—"ট্র্যাজেডি তো কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ফোল্ডারে রঙিন ছাপা হয়না যা দেখার জন্য যাত্রা রিজার্ভেশন করতে হয়, থাকার জায়গা সংরক্ষণ করতে হয়। ট্র্যাজেডি তো পাকা ধানক্ষেতে শিলাবৃষ্টির মত বা আকাশ থেকে আগুনের পাখিতুল্য প্লেনের মত ভেঙে পড়ে না। ট্র্যাজেডি তো লিপ্ত থাকে আমাদের দৈনন্দিনে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, বসে থাকায়, পথ চলায়, মৈথুনে, শয্যায়। ট্র্যাজেডি তো শুধু তার যে চায় ট্র্যাজেডি কে মুখোমুখি চিনে নিতে, ট্র্যাজেডি তো শুধু তার যে প্রতিদিনের বাতায়নদৃশ্যে দেখে নিয়তির নিদান, প্রতিদিনের বিরনাম একদিনই হেঁটে নামে পর্বতের সানুদেশ থেকে। ট্র্যাজেডি তো শুধু তার যে প্রতি রাতের সঙ্গিনীতে এক দিনই জানে মাকে, তারই মাকে। বিরনাম বিরনামেই আছে, কে তাকে অবতরমাণ দেখতে চাও দেখো, সঙ্গিনী যোনি মেলে শয্যাতেই আছে, সে যোনিতে নিজেকেই জায়মানকে কে দেখতে চাও দেখো।"

বাংলা ভাষার যে ঔপন্যাসিক এমন করে এমন আততিময় উপন্যাসের ঘোরে বাস করেন, করতে থাকেন, তার অনুপুঙ্খতায়, নির্মাণভাষ্যে, সর্বত্র, তাঁর লেখা জনপ্রিয় হল কি হল না, তা দিয়ে তাঁর সাফল্য বা ব্যর্থতার বিচার হয়না।

সমর সেন মারা যাবার পরে, সমর সেন সম্পর্কে প্রচুর লেখায় সমর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা হত। সম্ভবত মহাশ্বেতা দেবীই লিখেছিলেন, এখন ঠিক মনে নেই, অন্য কেউও হতে পারেন, যে কবিতা সমর সেন ছেড়ে চলে এসেছেন বহুকাল, তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর সেই ছেড়ে আসা কবিতা নিয়েই আলোচনা হয়ে চলেছিল, তার কারণ এই যে সমর সেনের পরবর্তীকালের কাজ 'নাও' পত্রিকা

এবং 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার—সেগুলি আলোচকদের আয়ত্তসীমার বাইরে ছিল—মেধার আয়ত্তসীমা। দেবেশ রায়কে যে পড়া হয়নি, বা দেবেশ রায়কে নিয়ে আলোচনা যে মূলত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় থেকে যাচ্ছে, এবং সম্ভবত বেশ কিছুকাল যাবৎ থেকেও যাবে, তার কারণও সম্ভবত এই যে দেবেশ রায়ের কাহিনি, দেবেশ রায়ের আখ্যান, দেবেশ রায়ের তত্ত্ববিশ্ব, দেবেশ রায়ের খোঁজ—এই সব কিছুকে ধরার জন্যে যে মেধার প্রয়োজন, যে পাঠের প্রয়োজন, যে নিবিড় পাঠের প্রয়োজন, তা আলোচকদের সাধ্যাতীত, আয়ত্তাতীত। ফলে এই বাস্তবতার মধ্যে আমাদের থেকে যেতে হবে—দেবেশ রায় নিয়ে যে কোনো আলোচনাই সাধারণভাবে ওই জায়গাটাতেই চলে যাবে। তা আমাদের খারাপ লাগবে, কিন্তু এই বাস্তবতাটা মেনেও নিতে হবে।

এই স্মরণালেখ্যটি শেষ হয়ে এসেছে। অন্তিমে, দেবেশ রায়ের উপন্যাস 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'-র শেষ অংশ 'পাঠককে শেষ দু চারটি কথা'-র শেষ অনুচ্ছেদ –

"তার চাইতে বরং আসুন আমরা আমাদের বিচ্ছেদ মেনে নিই—আপনার ও আমার বিচ্ছেদ—সে বিচ্ছেদ তো আমাদের মুক্তিও, আপনার ও আমার মুক্তি। এত দীর্ঘ সময় আপনার হাত আমার হাতে ধরা ছিল যে আমাদের দুজনেরই করতল পরস্পরের তাপে উষ্ণ হয়ে আছে। মানুষের করতল এত দীর্ঘ সহযাত্রায় উষ্ণ থাকার সময় এ নয়। আমাদের করতল পরস্পরের স্পর্শহীন ঠান্ডা হয়ে যাবার পরও এই বৃত্তান্তটি তার অখণ্ডতায় বেঁচে থাক, শুধু এই বৃত্তান্তটি।"